KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

"একতারা"।

(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রণীত)

দরদীর আঙুলের স্পর্শে একতারা যে সেতারকেও হার মানাতে পারে, দ্বিজেনবাবু তা দেখিয়েছেন—কিন্তু দাম্পত্য-প্রেমের সুর বক্তৃতার সভায় যতই উচ্চ হোক্ না কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তা এখনো মাথা নীচু করে আছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, ও-সুর বড় বেশি সংকীর্ণ, বড় বেশি গা-ঘেঁসা। ও-সুরে যে-যন্ত্রী যত প্রাণ-পণেই মূর্চ্ছনা দিন না কেন, অপরের হৃদয় তাতে মূর্চ্ছিত হয় না। পদাবলীর সুর যে একদিন বিশ্বের মরমে পৌঁছেছিল, তার কারণ, অন্যত্র যাই হোক্, রস-সাহিত্যে পরকীয়া, পত্নীর চেয়ে বড়। সে পরকীয়া রাধাই হোন আর রজকিনীই হোন্।

সোজা কথায় বলতে গেলে কবির পার্থিব প্রিয়া যে পরিমাণে মানসী সেই পরিমাণে তিনি কাব্যের বস্তু—যে পরিমাণে তাঁর ব্যক্তির রূপটি ধর্ম্মের রূপে মিলিয়ে যায়, সেই পরিমাণে তিনি বিশ্বের চোখে সুন্দর। তবে একথা জোর করে বলা যায় যে, যে তারে দাম্পত্য-প্রেম স্ফুরিত, সেই তারেই কবি মাঝে মাঝে ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎ এমন ভাবে সঞ্চারিত করতে পারেন যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মন চুম্বকের মত অসীমের দিকে ফিরে যায়, দ্বিজেনবাবুর 'একতারা'য় সেই বিদ্যুতের প্রবাহ আছে।

এ যুগের প্রায় সমস্ত কবির রচনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছাপ দেখা যায়। এটা সজ্ঞান অনুকরণ না হলেও অনুকরণ এবং অনুকরণ আর কিছু না করুক্ ব্যক্তিত্বকে লোপ করে দেয়। অবশ্য এ অনুকরণ খুবই স্বাভাবিক, খুবই ক্ষমার্হ—কারণ অত বড় কবির জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রজাল ভেদ করা যে-সে শক্তির কাজ নয়; কিন্তু এটাও ঠিক যে, তা না করা পর্য্যন্ত কোন লেখক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে না। দ্বিজেনবাবু সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিক ভাবে সে ইন্দ্রজাল থেকে মুক্ত।

গোড়াতেই বলেছি 'একতারা' ভাবের গুণে সুন্দর। কিন্তু ভাবের রূপ কেবল মানসী নয়—শব্দের নির্ব্বাচন ও সংযোজনকে আশ্রয় করেই তা স্ফূর্ত্ত। অতএব কাব্যের ভাষাও দেখা দরকার।

দ্বিজেনবাবুর কবিতার ভাষা খুবই মোটা, খুবই সাদাসিদে—মনে হয় এ পরিচ্ছদ দিয়ে তিনি কোন্ সাহসে তাঁর বড় বড় ভাবগুলিকে সাজিয়েছেন; কিন্তু ঠিক সংকুলান হয়েচে—বেমানান হয় নি। দ্বিজেন-বাবুর হেলাফেলার ভাষা যতই আটপৌরে হোক্—তা নিখুঁত, যতই অসতর্ক হোক্—তা অবাধ, ভাবের স্বচ্ছন্দতাকে তা আড়ষ্ট করে ফেলে নি।

নমুনা তুললেই দেখতে পাবেন।

"আইন দিয়ে যতই বাঁধো তুমি
প্রাণ-সাগরের বিপুল বেলাভূমি
সহজ মনের যতই রচো কারা,
নিমেষে সব বাঁধন ফেলে টুটি

গতির সুখে উধাও যাবে ছুটি
বে-আইনির হাজার নতুন ধারা।"

ধর্ম্মে বল, সাহিত্যে বল, সমাজে বল, জীবনে বল, এত বড় সত্য আর কি আছে? কিন্তু যতবার পড়ি, আরব্য-উপন্যাসের সেই ধীবরের মতই সন্দেহ হয়—এতটুকু শিশির মধ্যে অত বড় দৈত্য ছিল কি করে'। আর একটি উদাহরণ দিই।

বিরহ সম্বন্ধে কবি বলেছেন :—

"যে বেদনা মোর তোমার বিরহে
সকল ব্যথার সার।
তুমি বিনে বল সে ব্যথার ব্যথা
মরমে পশিবে কার?
কানে পশে শুধু কথার কাকলী,
ভাব নেয় ভাব চিনে,
তোমার অভাবে যে ভাব মরমে
কে বুঝিবে তোমা বিনে?"

জানিনে, এত সাদা কথায়, চণ্ডীদাস এর চাইতে কি ভাল লিখতে পারতেন।

দ্বিজেনবাবু সম্বন্ধে এ কথাটি বলা যায় যে, প্রাণের তারটি না বেঁধে তিনি গান জাগাতে সাহস করেন নি।

দ্বিজেনবাবুর কবিতায় সত্য-সন্ধতা ছাড়াও এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় আছে, যা প্রত্যেক বড় কবির নিজস্ব। যা সকলেই

দেখে, সকলেই শোনে, যা সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তার অতীত কিছু কবির ইন্দ্রিয়ে পৌঁছান চাই; উদাহরণ—

"ও-পার হতে ব্যথা তব এ-পার হতে মম
আঘাত করি, কাঁপিয়ে তুলে সব
না পড়ে আর বস্তু চোখে ব্যথায় লহর সম
সবই প্রাণে হয় গো অনুভব।"

এই যে অনুভব, এ কখনই প্রাকৃত জনের হতে পারে না। বিরহের ক্লেশ প্রায় সব লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু বিরহের বেদনার আঘাতে যে ব্যবধানের নদী, ক্ষেত, লোকালয় বস্তুহীন ব্যথার লহর হয়ে দাঁড়ায়, এটা কেবল কবিই অনুভব করতে পারেন।

দ্বিজেনবাবুর সব অনুভূতিই যে ভাষায় পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়, তা নয়, তবে তাঁর কণ্ঠের অপরিস্ফুট কাকলীতেও একটা উচ্চ সঙ্গীত প্রকাশের প্রাণপণ প্রয়াস আছে।

কবির বিচিত্র কল্পনাও (fancy) সুন্দর। প্রথমেই তিনি প্রিয়াকে করেছেন দেউলের দেবী। তীর্থ-যাত্রীর মত ঘুরে ঘুরে যেদিন তিনি দেখতে পেলেন—

"ঐ রাঙ্গা পা দুটী
দীর্ঘ পথের মৃণাল শিরে রক্ত কমল ফুটি"

সেদিন তাঁর পথ-চলা ধন্য হলো; আবার কখনো প্রিয়াকে করেছেন "জীবন পথে পড়ে পাওয়া কুড়িয়ে নেওয়া বাঁশী। সে বাঁশী কবির "আপন হাতে গড়া" নয়, "বাঁশীর হাটে বেছে নেওয়া নয়, এমন কি তার জন্য কবিকে কানা কড়াও দিতে হয় নি। কবি ভাবতে পারেন নি যে, তার কিছুমাত্র মূল্য থাকতে পারে। তিনি খেলার ছলে তাকে অধরে ছুঁয়েছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! "সুরের ফুলে ভারে ভারে উঠ্‌লো বাঁশী মুঞ্জরি", আর সে যে-সে সুর নয়, একেবারে "ভুবন ভোলানো" সুর। কাজেই কবির মনে এই উদার আশা জাগ্‌লো—

"সকল আকাশ ভরবো আমি
তোমার ও সুর দিয়ে।"

দ্বিজেনবাবুর চিত্রণ শক্তির পরিচয় দিতে বড় বেশি আয়োজনের প্রয়োজন নেই—দু'চার ছত্রই যথেষ্ট—

"ফেলিয়ে সকল ভূষা, এলে নিশীথে,
এলে ধীরে, চুপে চুপে, এলে চকিতে,
একেবারে বুকে নিলে, বাহুপাশে জড়াইলে,
চিরতরে জুড়াইলে চির-তৃষিতে।"

একটা গোটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল; প্রত্যেক শব্দটির মুখে একটি বর্ণ, একটি রেখা।

যেখানে কবির চিত্র অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুট, সেখানে তা আরো সুন্দর, আরো জীবন্ত।

"দেহের কূলের ভাঙ্গন যত,
মনের কূলে গড়বে তত"

বা

"ছল ছল আঁখির মত পরাণ উঠে উথলি"

অথবা

"তারার আলো নিশার প্রাণের স্বপন সম ভার"

দু-টানে এমন ছবি ক'জন চিত্রকর আঁকতে পারেন ?

"একতারা"য় এমন একটু দার্শনিক সুবাস আছে, যা বিশেষ করে' ভাবুকদেরই উপভোগ্য। দার্শনিকতার সঙ্গে যে কবিত্বের একান্ত বিরোধ, একথা আমি অস্বীকার করি। সুকবির হাতে ও-দুই-ই যে রত্নের আকর, তার প্রমাণ দ্বিজেনবাবুই দিয়েছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন—

"হাওয়ায় যে বীজ উড়ে এসে লাগে মনের উপর দেশে
তার সে ক্ষণিক ফুলের নেশায় পরাণ আমার ভুলবে না,
প্রাণের গোপন গভীর তলে রসের চির ধারা চলে
সেথায় যদি না রহে মূল সুধার ফল যে ফলবে না।"

সেখানে বুঝতে পারি না তাঁর জ্ঞানকে কি কবিত্বকে বেশি প্রশংসা করবো।

"মুকুল ছুটে যে পথ দিয়ে সমুখ পানে ফলের মাঝে
আমার এ সুর ধরিয়ে দিতে চায় গো তা যে,
পিছন সনে সমুখের ভাই সত্য কোথাও বিরোধ নাই
একই বাঁশীর সুরটী সবার বক্ষে বাজে।"

একটি ঘরের কোণের উপমা দিয়ে কবি সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কালের একটানা স্রোতে যা অতীত তাই বর্ত্তমান; অতীত মরে না, বর্ত্তমানের ভিতর বেঁচে থাকে। নূতন পুরাতনের চিরপ্রসিদ্ধ বিরোধ কেবল স্থূল দৃষ্টিতে।

দ্বিজেনবাবুর দার্শনিক মতের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দু'টি থেকেই পুরোপুরি পাওয়া যায়—

"মুক্ত রেখেই ফেল্‌লো সে যে বিষম ঘোরে
* * * *
বাঁধন-সৃজন-নেশায় এ মন উঠল ভরে"

বোঝা গেল কবি freedom-বাদী; বাইরের বন্ধনই তাঁর কাছে একমাত্র বন্ধন—আবার তিনি লিখবেন।

"যেখানে মোর প্রাণের বাঁধন মুক্তি আমার সেইখানে"। বোঝা গেল কবি একজন মস্ত বড় optimist. শৃঙ্খলার শৃঙ্খল তাঁর কাছে মুক্তিপাশ।

আর একটি দার্শনিক কবিতার দু' ছত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—যার ভিতর একটি বড় সত্য ফুটে উঠেছে।

"ভয় ত শুধু আপন মাঝে আপন পরে অবিশ্বাস,
ভয় ত শুধু মূঢ় প্রাণের প্রেমের প্রতি পরিহাস।"

দ্বিজেনবাবুর "একতারা" সম্বন্ধে এবং "একতারা"র মধ্য দিয়ে যে কবি মানুষটি ফুটে' উঠেছে তার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যা বলেছি—তা প্রায়

সমস্তই নিক্তির একদিকে পড়েছে—এবার অন্যদিকে কি পড়তে পারে দেখা যাক্।

"একতারা"র কতকগুলি কবিতা একেবারে দুর্ব্বোধ। কথায় কথায় অর্থ হয়ত করা যেতে পারে কিন্তু তাতে আগাগোড়া একটা সুস্পষ্ট সুসঙ্গত ভাবের একান্ত অভাব। কষ্টকল্পনার সাহায্যে হেঁয়ালির অর্থ করা যাঁদের অভ্যাস আছে তাঁরা কি বলবেন জানি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে ও-গুলো কুয়াসার মতই ঝাপসা।

দ্বিজেনবাবুর কবিতাসুন্দরীর দেহও স্থানে স্থানে ছন্দ দোষে দুষ্ট। যদিও সে দোষ তিলের মতই ক্ষুদ্র। তিলকে তাল করে' লোকের চোখে ধরে দেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। কবি অনুসন্ধান করে' নিজেই সেগুলি বের করে নেবেন এবং চাইকি ইচ্ছা করলে একটা তুলির টানে তা বেমালুম মুছে ফেলতে পারবেন। আমার বিশ্বাস এ তাঁর অসাবধানতার দোষ, কানের দোষ নয়।

তারপর আর একটি কথা। একটা কবিতা একটা গোটা কাপড়ের মত। সে কাপড়ের খানিকটা সূতি, খানিকটা রেশমী, খানিকটা মোটা, খানিকটা মিহি, খানিকটা সাদা, খানিকটা রঙ্গীন হলে বড়ই দুঃখের কথা। দ্বিজেনবাবুর কবিতার এ দোষটুকু প্রায়ই দেখা যায়। তাঁর দিব্যি রঙ্গীন মিহি কথার পর হয়ত এমন মোটা সাদা কথা এল যে, ইচ্ছে হয়, সেটুকু কেটে ফেলে দিই।

তবে মোটের উপর দ্বিজেনবাবুর 'একতারা' এতই সরস, এতই উপাদেয় হয়েছে যে, তার দোষগুলিকেও অপকর্ষক বলতে ইচ্ছা হয় না —এ সম্বন্ধে কবির ভাষাতেই আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি—

"ফুলের ত্রুটী নয় গো কাঁটা
কাঁটাই সফল হয় গো ফুলে।"

এবং আর যেই ভুলুক

"মরম-মধুর সন্ধানীরা
এ কথাটা যায় না ভুলে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সাহিত্য ও নীতি।

—:০:—

দার্শনিক অদার্শনিক, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, কবি অকবি—সবাই এ কথা স্বীকার করিবেন যে, মানুষের মধ্যে সব-চেয়ে বড় না হোক্, সব-চেয়ে উঁচু আর খাড়া হইয়া আছে যে সত্যটা, সেটা হচ্ছে তার অহং। আমাদের কাহাকেও মুখের উপর অহংকারী বলিলে আমাদের মধ্যে যে অতিবড় ধার্ম্মিক, তার-ও পক্ষে সেটা ভালমানুষের মত মানিয়া লওয়া যে তত সহজ-সাধ্য হয় না, এই প্রমাণ যে অর্ব্বাচীন জনসাধারণের চেয়ে তার "অহং" কিছু কম উগ্র নয়। প্রতি নিমেষে সযত্নে আমরা একেই লালন করিয়া থাকি, আমাদের সমুদয় জীবনবৃত্তান্ত হচ্ছে ইহারই চারিপাশে ঘুর্ণি নাচের একটি ছবি। এমন কি, মেথরদেরও সর্দ্দার আছে। যে ধূলার তলে দলিত বিদলিত হইয়াছে, তার সমস্ত রিক্ততার মধ্যেও মনের এক কোণে ইনি যে জাগিয়া নাই তা কেমন করিয়া বলা যায়?

অথচ নিজেকে অহর্নিশ মন্দিরচূড়ার মত শূন্যের মধ্যে খাড়া করিয়া ধরিয়া রাখার জন্য মানুষের এই যে চিরন্তন দুর্নিবার ঝোঁক, ইহার চেয়ে কম সত্য নয় মানুষের মধ্যে আর একটি প্রবলতর প্রবণতা, সে হচ্ছে তার নুইয়া পড়ার প্রবৃত্তি। মানুষ এ বিশ্বে কা'কে যে প্রণাম করে নাই তা বলা শক্ত। আকাশের মেঘ, নিশীথের

তারা, সমুদ্রের হাওয়া, জঙ্গলের আগুন, বনের সাপ, বানর, বাঘ—শেষে বাস্তব জগতেও সাধ না মেটার দরুণ কল্পনার দেশের ভূত পিশাচ যক্ষ দানব—কার কাছে মানুষ "মাথা নত" করে নাই? কার্লাইল্ দেখাইয়াছেন, সমগ্র মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ইতিহাস।

জনসমাজ প্রতীক্ষা করিতেছে, কবে অবতার আসিবেন, তারা অনুসরণ করিবে, সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া তারা তাঁকে গ্রহণ করিবে, পূজা করিবে। জনসমাজ হচ্ছে একটি অশ্ব, যে ছুটিতে জানে কিন্তু গন্তব্য জানে না—নেপোলিয়ান আসিলে তবেই ফরাসী ঘোড়া তার গন্তব্যে পৌঁছিতে পারে—তাঁর বাহন হইয়া। মানুষের শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে বন্দনার আর্ট। বাদশার যোড়হাতের এক অঞ্জলি ফুল, সে পাথর হইয়া গেয়া তাজমহল হইয়া উঠিল। মানবের সমস্ত যুগযুগান্তরের কাব্য-সাহিত্যের গুঞ্জন দূর হইতে দাঁড়াইয়া শুনিলে কেবল এই ধ্বনি শুনিতে পাই—"নমো নমো নমঃ"। মানুষের শ্রেষ্ঠ গান হচ্ছে—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।"

(২)

জল যে সমুদয় ভূমণ্ডলে এ ভাবে ওতপ্রোতরূপে সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছে, তার কারণই হইতেছে এই যে, "নীচু বিনা উঁচু পথে জল কভু যায় না"। বাইবেল বলেন, "The last shall be first." আরো বলেন, "পৃথিবীর উত্তরাধিকার তাদেরই—যারা নুইয়া পড়ে, যারা meek." নমস্কার-ই হচ্ছে সর্ব্বত্র প্রবেশের পথ। আপিশে ঢুকিবার প্রধান উপায় যে সেলাম, তা কে না জানে?

ধার্ম্মিকতা যদিও আজকাল দাম্ভিকতারই নামান্তর, তথাপি গোড়াতে ধর্ম্ম যে এতটা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, সম্ভবত তার কারণ, ধর্ম্ম তখন নম্র ছিল, এবং তাই নর্ম্মদা বা তাদৃশী কোনো নদীর পুলিনেই সে নিলীন ছিল না। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো কাননের পথে পথে বেণু বাজাইয়া ধেনু চরানো নয়, প্রাতরুত্থান থেকে জীবনের সমুদয় কার্য্যাবলীকে ধর্ম্ম কি প্রকার শুভঙ্করের আর্য্যা দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, তা যে-কোনো পঞ্জিকার পাতা উল্টালেই প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপ যে হইতে পারিয়াছিল, তার কারণ এই যে, তখন ধর্ম্ম ছিল একটি গানের সুর, যা চিরদিন-রজনী মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিত—প্রকাশের বেদনায়, এবং তৎকালে বক্তৃতামঞ্চাদি না থাকায় তা অকস্মাৎ আগ্নেয়-গিরিদ্রাবরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িবার সুযোগ না পাইয়া, সমুদয় জীবনকেই একটি ছন্দে পরিণত করিত—ছন্দকে গান থেকে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে চিরকালই তা কুচ্‌-কাওয়াজের মত দেখায়। "তব গানের সুরে চিত্ত আমার রাখ হে রাখ ধরে—কভু দিয়ো না তারে ছুটি"—ধর্ম্ম ছিল সেই সুরের মধ্যে বিধৃত চিত্তের একটি "মনোভাব", একটি attitude, tendency, একটি spirit—দেয়ালে টাঙান একটি motto মাত্র নয়। যাকে ইংরাজিতে বলা যায় "leavening of the bread"—ধর্ম্ম সেই-রূপ সমস্ত জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩)

সর্ব্ব-সংক্রামকতা, সর্ব্ব-সঞ্চারিতা ও সর্ব্বগতা পর্য্যায় শব্দ হইতে পারে, সর্ব্বগতা কিন্তু সর্ব্বগ্রাসিতা নয়। সমস্ত ভূতে যিনি আপনাকে

দেখেন, এবং আপনাতে সমস্ত ভূতদের দেখিতে পান তিনি সর্ব্বগ, কেননা তিনি সর্ব্বত্র গমন করেন—অব্যাহত তার প্রবেশ—"যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে, সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে—সোনার ঘটে সূর্য্য তারা নিচ্চে তুলে আলোর ধারা, অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে"—তিনিও সেইখানে তাঁর রূপার ঘট লইয়া হাজির। তিনি নিজের চৈতন্যকে দিগ্‌বিদিকে প্রেরণ করিয়াছেন—সমুদ্র যেমন মেঘদের প্রেরণ করে—মেঘ যেমন বিন্দুদের প্রেরণ করে—ত্যাগের দ্বারা, অহিংসার দ্বারা—তাঁর সাধনা গ্রাস করিবার সাধনা নয়। "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth"—একটু একটু করিয়া annex করিয়া নয়, একেবারে চক্ষু মেলিয়াই সে দেখিতে পাইল সমস্ত ভুবন তারই জন্য।

ধর্ম্মের ব্যাপকতা যখন সর্ব্ব-গ্রাসিতার রূপ ধারণ করিল তখন সে রাজদণ্ড হাতে লইল, পোপ হইল, ব্রাহ্মণ হইল। লুথরের প্রয়োজন হইল, বুদ্ধ আসিল।

(৪)

ধর্ম্ম এক সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল। সেই জন্যই যেমন বাইবেল তেমনি আমাদের পুরাণগুলিতেও দেখিতে পাই, সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যার একটা প্রকাণ্ড প্রচেষ্টা। বাসুকি একটু ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদের ঐ পুকুরটা আমাদিগকে কি রকম সাধু বাঙলার উচ্ছ্বাসের কতকগুলি উপকরণ জুটাইয়াছিল, তা'ত আমাদের

সকলেরই মনে আছে—অর্থাৎ "মন্তবিধুনিত উত্তাল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ" ইত্যাদি। ইংলাণ্ডে এই অনধিকার-প্রবেশ কি-রকম গলাধাক্কা খাইয়াছে ও-দেশের সাহিত্যে তার ফোটো রহিয়া গিয়াছে।

(৫)

সাহিত্যক্ষেত্রে আর্টের সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির বিবাদটি অপ্রসিদ্ধ নয়—এবং সাহিত্য আর যাই হোক্ বিজ্ঞান নয়—যদিও বিজ্ঞান সাহিত্য কিনা সে-সম্বন্ধে তর্ক আছে! সাহিত্য হচ্ছে আর্ট, আর এ-সম্বন্ধে যে দল যাই বলুক, সাহিত্য হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট। বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের তফাৎই এই যে বিজ্ঞান বলিয়া দেয় আর আর্ট বানায়—এবং আর যে আর্ট যা বানাক্, সাহিত্য যা বানায় তা হচ্ছে "মানুষ" এবং প্রকৃতির এই "fair defect"টি-ই নাকি আবার সৃষ্টির মধ্যে noblest thing. তারপর, অন্য সকল আর্টিষ্টের মালমসলা জড়—রং, পাথর, কাপড়, বড়-জোর বায়ু তরঙ্গ। আর সাহিত্যিকের কারবার হচ্ছে শব্দ লইয়া, আর শব্দ পদার্থটা আর কিছুই নয়—আইডিয়া-বাষ্পের জমাট টুক্‌রা। অন্য অন্য আর্টের মত মানুষের চক্ষু এবং শ্রোত্রকে সাহিত্য কিছুই যে আনন্দ দেয় না, তা নয়; কিন্তু সে গৌণভাবে। সাহিত্য হচ্ছে মনের সঙ্গে মনের সোজাসুজি আলাপ—যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়কে পিছনে রাখিয়া। আর এই মনই হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্বর্গ থেকে চুরি-করা বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ম্যাথু আর্ণল্‌ড্ কাব্যকে "Criticism of life" বলিয়াছিলেন। যদিও সমালোচনা বলিতে আমরা বুঝি সমুদয় ভালকে যথাসম্ভব মন্দ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া মন্দটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলা,

উক্ত অধার্ম্মিক ও বৈধার্ম্মিক দেশের অধিবাসীটি কিন্তু ও-শব্দের অর্থ বুঝিতেন ঠিক উল্টা। জীবনের মধ্যে অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে—যেমন এই মুহূর্ত্তে আমাদের এই শরীরের মধ্যে এমন সব ব্যাপার চলিতেছে, যা অতি নক্কারজনক অথচ অপরিহার্য্য, তেমনি জীবনের কদর্য্য অংশ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া আছে। তারও একটা সৌন্দর্য্য যে নাই তা নয়—পরিপাক-ক্রিয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা হয়ত উপভোগ্য। মহিষ-বলির পরে রক্ত মাখিয়া যে নৃত্য, তার বীভৎসতাও ত মানুষে উপভোগ করিয়াছে। তেমনি বায়রণ প্রভৃতি কবি জীবনের যে অংশকে অনাবৃত করিয়াছেন, তারও একটা মোহনীয়তা আছে, বরঞ্চ অনেকের কাছে তার আকর্ষণ অতি প্রচণ্ড। কিন্তু সাহিত্যের কার্য্য তা নয়, তার কাজ জীবনের মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা শাশ্বত, যা সত্য, যা মঙ্গল, তারই জয়গান করা, তাই সমুখে আনিয়া ধরা। সাহিত্যিক ম্যাকবেথের দুরাকাঙ্ক্ষার বীভৎসতাও আমাদের দেখান, কিন্তু তা কেবল তার থেকে আমরা দূরে থাকিব বলিয়া। অথচ, সোজাসুজি নীতিকথা প্রচার সাহিত্যের কার্য্য নয়। সাহিত্য আর যাই হোক ইস্কুলমাষ্টার নয়। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প আর কথামালা বই বটে কিন্তু সাহিত্য নয়। এইখানেই সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মের সাদৃশ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সাহিত্য এবং ধর্ম্মের মধ্যে সালোক্য নাই এইজন্য যে, যদিও তারা একই কার্য্য করে, তবু আলাদা "লোক" অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে। ধর্ম্ম হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিক শক্তি, যা সমুদয় জীবনের মর্ম্মস্থলটিকে এক নিমেষে স্পর্শ করিয়া এমনি ধাক্কা দেয় যে, তার পর থেকে সেই মানুষই হয় আলাদা মানুষ। তার পর থেকে কি করা উচিত অনুচিত তার জন্য আর

তাকে দ্বিতীয় ভাগ ও কপিবুকের নীতিমালা অধ্যয়ন করিতে হয় না। সমস্ত দুর্নীতি সমস্ত মন্দের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে তার মনে, আর নীতির কুঠার দিয়া প্রতিদিন পাপের ডালপালার ছেদন করিতে হইবে না। ফ্রাঙ্কলিনের মতো রুটিন্ করিয়া এ সপ্তাহে মিথ্যা, ও সপ্তাহে চুরি, তার পরের সপ্তাহে বাচালতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মরিতে হইবে না। সাহিত্যও শিক্ষা দেয় কিন্তু আনন্দের মধ্য দিয়া। আসলে, আনন্দিত করাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর মানুষকে আনন্দিত করা হচ্ছে তাকে প্রকৃতিস্থ করা—আর সাহিত্যিক মানব-প্রকৃতির উপরে বিশ্বাসবান।

(৬)

কাব্য এবং ধর্ম্ম সহোদর ভাই। কেননা একই জায়গায় তাদের উৎপত্তি। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনির্ব্বচনীয় রহস্যের কাছে মানুষের বলবুদ্ধি হারিয়া গিয়া বলিল, "নমোনমঃ", তাইত বেদগান। বিশ্বের নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য, মানুষকে তার অধীন হইতেই হইবে নইলে "মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"—এই ত Old Testament. সমস্ত জীবনের দ্বারা উচ্চারণ করিতে হইবে এই মন্ত্র—"নমোনমঃ"—সমস্ত বিশ্বভুবন ত দিনরাত এই মন্ত্র জপ করিতেছেই—রবি শশী গ্রহ তারা ত মহাশূন্যে জপ মালা ঘুরাইয়া চলিয়াছেই—এই চারদিকের আকাশে বাতাসে প্রত্যেকটি অণুপরমাণু অমোঘ নিয়মকে এই মুহূর্ত্তে মানিয়া ত চলিতেছেই, মেঘেরা ছুটিয়াছে, বায়ু ছুটিয়াছে—মহাশাসনে বাধ্য হইয়া, কেবল মানুষের ইচ্ছা সে স্বাধীন, সে খুসি হইলেই এই নিয়মের প্রতিকূলেও

চলিতে পারে—তাইত তার এই নমস্কার-সঙ্গীত বিশ্বভুবনের আর সকল সঙ্গীতকে ছাপাইয়া উঠিল—সমস্ত জীবনের নমস্কার, একটি চিন্তা মনে উঠিবে না, কখনো কোনো মুহূর্ত্তে যা এই বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গী বিসংবাদী, ইহাই নীতি।

ফিলসফি কাব্যের বোন্ হইতে পারে, কিন্তু বৈমাত্র। কেননা এই বিশ্বের নিবিড় রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করিবার প্রবৃত্তি দর্শনের জননী—কাব্য কেবল বলে "যা দেখেছি তুলনা তার নাই"। তুচ্ছতম যা ঘটনা, প্রতিদিনের যা দৃশ্য, সাধারণতম মানুষ, ক্ষুদ্রতম ফুল—তারও রহস্য অপার। ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাই ঘাসের মধ্যে Celandine-কে আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা নক্ষত্র আবিষ্কার করুক্, আমি তোমাকে আবিষ্কার করিয়াছি, এই আমার গৌরব।

(৭)

সাহিত্য হচ্ছে একখানি দর্পণ, যার আশ্রয়ে নরসমাজ পুনঃপুনঃ আপনার মুখ প্রসাধন করিয়াছে, যা কুৎসিত তাকে দূর করিয়াছে। "Uncle Tome's Cabin"—নীগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের চৈতন্য জন্মাইয়াছিল। রুশোর লেখাগুলি ফরাসীদেরকে তাদের কৃত্রিম সমাজের কদর্য্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেওয়ার পর যা যা ঘটিয়াছিল তা কে না জানে? আমাদের দেশে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলি আমাদের নারীদের অসীম দুঃখদুর্গতির চিত্র আঁকিয়া যুবকদের মধ্যে নারীজাতির প্রতি তাদের মনোভাবের অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র দর্পণের উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি দর্পণ হইতে পারে, কিন্তু অন্য গানগুলি তর্পণের মন্ত্র। আর, তারা এই দেশের মনের উপর কি কার্য্য করিয়াছে তা মাপিবার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই।

সেই দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—মানুষের হৃদয়ের কত কত আশা ভরসা, লজ্জা দৈন্য, ঘৃণা বিরক্তি, অবসাদ নিরাশা, বিস্ময় ক্রোধ, ভালবাসা ভক্তি। কিছুই বাদ যায় নাই, মানুষ ত পূর্ণ নয়, তার শত বিফলতা, শত অকৃতার্থতা, শত জঘন্যতা সহস্র গ্লানি। সাহিত্যকে তার সাক্ষ্য বহন করিতে হইতেছে। এ যেন একখানা "অদ্বৈতবাদী"র জগৎ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যেখানে যা আছে—যতকিছু পঙ্কিলতা, যত-কিছু পাপ, সমস্তকে লইয়া অগ্রসর হইতেছে এই জগৎ। স্থান আছে—সকলের জন্যই স্থান আছে। কেবল ফুলের গন্ধে আর মলয় বাতাসে আর জ্যোৎস্নায় ভর্ত্তি একখানি কল্পলোক নয়—ঘরে ঘরে বেদনার রাশ, নিখিলের ব্যথা, দিকে দিকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভারে ভারে স্তূপীকৃত—মাতার প্রতি সন্তানের দুর্ব্যবহার, প্রেমের শূন্য গর্ভতা, দরিদ্রের ক্রন্দন—Les Miserables, এ সমস্তকে পান করিয়াছে যে সাহিত্য তারই হাতে দুর্জ্জয় ভৈরব পিনাক। তারই বিকট জটাজূটের মধ্যে অমৃত প্রবাহিনী।

(৮)

কিন্তু জীবনের মধ্যে যা আছে, হুবহু তার ছবি তোলা ফোটোগ্রাফারের কাজ হইতে পারে, সাহিত্যিকের নয়। সাহিত্য জীবনের ছায়াচিত্র নয়, ভাবচিত্র। কোকিলের ডাকের নকল করিতে

পারে আমাদের হরবোলা, কিন্তু হরবোলা আমাদের যা দেয়, তা হচ্ছে কোকিলের ডাকের দেহখানি—কোকিলের ডাকের মর্ম্মগত যা বাণী, যা কুহুতানের অন্তর্লোকাধিষ্ঠিত বিদেহ আত্মা, যা যুগে যুগে কত গৃহে, পথে পথে, কত কান্তারে নিখিলের মনের ব্যথাকে দেহ-দান করিয়াছে—তা আমরা হরবোলার নকলের মধ্যে পাই না, তা পাই কবির কাব্যে। কবি বলেন, "আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি, রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী"। বাহিরের এই বিশ্ব কবির চিত্ত-বীণার তারে তারে ঘা দিতেছে—তার থেকে আমরা পাইতেছি এক অপরূপ সঙ্গীত। কোন কোনও ব্যক্তি যে কাব্যখানিকে "that Epic of Realism"—"বস্তুতন্ত্রতার মহাকাব্য" বলেন, বায়রণের সেই "Don Juan"-এর মধ্যে আমরা পাই নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের অস্থিরতার একটি বিচিত্র বাস্তব চিত্র। পড়িয়া আমরা বলি, হাঁ ঠিক, সমস্ত সামাজিক ভদ্রতা, পারিবারিক বন্ধন, ধর্ম্মনৈতিক বিধি-বিধানের তলে তলে সর্ব্বত্র ইহাই ত ঘটিতেছে—এ-সব কে না জানে?– ইহা হইতেছে সংসারের একখানি জল-জীয়ন্ত ফোটোগ্রাফ্। ফোটোগ্রাফ্ হিসাবে ইহা উপভোগ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে হৃদয়ের লাল রঙ্ কই? একটি মানুষের জন্য আর একটি মানুষের যে ক্ষুধা ইহা ত সনাতন সত্য। কিন্তু সেই ক্ষুধার সমস্ত প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও একটি মানুষ যে আর একটি মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে আপন অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত, আত্মসাৎ—করিবার প্রয়াসে বিফলকাম হয়—এমার্সনের ভাষায় Marrige (in what is called the spiritual world) is impossible"—সমস্ত মানবীয় সম্বন্ধগুলি যে কেবল বাহিরের একটা সংঘর্ষ-মাত্র—নিকটতম হৃদয়টি যে লক্ষ যোজন দূর—এই যে একটি সত্য ইহা কি

বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন একটি তথ্য মাত্র? ইহার কি কোনও "রস" নাই? ইহা কি কেবলই রঙ্গ-রসের রহস্যের ব্যাপার, ইহার মধ্যে কি এই বিশ্বের এবং জীবনের আর একটি রহস্যের নিবিড়তা নাই?

অর্জ্জুন যেমন তাঁর সুতীক্ষ্ণ সায়কের দ্বারা পৃথ্বীকে দীর্ণ করিয়া অতল হইতে রসের উৎসকে উৎসায়িত করিয়া পিপাসু মৃত্যু শয্যাশায়ী ভীষ্মকে তর্পণ করিয়াছিলেন, আর্টিষ্টের হাতে তেমনি এই সত্যটি হচ্ছে একটি শর, যা নিখিলেশের মর্ম্মকে ভেদ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু পিপাসু, আমাদের জন্য নিখিলেশের জীবন হইতে বাহির করিয়াছে সেই সুধা যা ক্ষতবিক্ষতচিত্ত গ্লানিক্লান্ত মানবের জন্য অতি-দুর্ল্লভ এক সঞ্জীবনী। নিখিলেশের সঙ্গে আমরাও জীবন এবং মৃত্যুর রহস্যকে নমস্কার করি—যে "দুঃস্বপ্ন" কোথা হ'তে এসে জীবনে বাধায় "গণ্ডগোল", তার থেকে অদ্ভুত ব্যথার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া আমরা নিখিলেশের সঙ্গে দেখিতে পাই যাকে নিবিড় করিয়া ধরা গিয়াছে সে আয়না-মাত্র—সে আয়না বাঁকা বা ভাঙা আয়না হইলে তার সেই বক্রত্ব বা ভগ্নত্বই একান্তভাবে আমাদিগকে পীড়িত করিবার কারণ হওয়া ঠিক নয়—সে আয়নায় যাকে প্রতিফলিত করার কথা ছিল, তাকে পূর্ণ করিয়া বিম্বিত করার ব্যর্থতাই বেদনার জননী।

সে বেদনা সমস্ত বিশ্বেরই বেদনা—সে "অতি নিবিড় বেদনা বন-মাঝে রে, আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে", সে ব্যথাই ত "সারানিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়"। সমস্ত জড়জগতের যে সুবিপুল ব্যর্থতা—চৈতন্যকে স্পষ্ট করিবার, মূর্ত্তিমান করিবার বিফলতা—সে সম্বন্ধে জড় ত নিজে চেতনাহীন। তবু "বাতাস আসে হে মহারাজ গন্ধ তোমার মেখে"—মহারাজ নাই

গন্ধ আছে। অস্থিরতার আঘাত জড় চিত্তের মধ্যে যে ব্যথা দান করে, সেই ব্যথা নিজেকে জানে না, সে চেতনাহীন। তবু "সুদূরের পারের সুদূরের হাওয়াই" অপেক্ষা করিতেছে স্নিগ্ধ হাত বুলাইবার জন্য সে ক্ষতের উপরে।

(৯)

এই জীবনের "তৃষার পরে ভুখার পরে" "শ্রাবণের ধারা" ঝরিয়া পড়িবার জন্য "নিশিদিন" উন্মুখ। "এই জীবনেই জন্মজন্মান্তর" ঘটাইতে পারেন যিনি তিনি "সুন্দর"। সুন্দরের দৃষ্টি হচ্ছে সমগ্রের দৃষ্টি—সমগ্র হইতে ছিন্ন যে খণ্ড সে কদর্য্য। জীবনের সমস্ত খণ্ড ঘটনা, সমস্ত ছোটখাট কাজ, সমস্ত ব্যবহারকে জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে সুসমঞ্জস করা, বেখাপ হইতে না দেওয়া, তালভঙ্গ হইতে না দেওয়া—ইহাই নীতি। সসীম জীবনের উপরে অনন্তের আহ্বান—ইহাই ধর্ম্ম। মৃত্যুর দ্বারা অখণ্ডিত চির-প্রবহমান যে জীবনধারা তারই কুলুনাদ ধর্ম্ম। কবরের পরে কি হবে, এই চিন্তাই ত ধর্ম্মের জননী। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—ধর্ম্ম হচ্ছে মধু, এবং মধু হচ্ছে এমন এক পদার্থ যে, ইন্দ্রিয়গ্রামকে সমগ্রভাবে অভিভূত করে। আলাদা আলাদা করিয়া সা-রে-গা-মা চেঁচাইলে তা কীদৃশ উৎকট, হার্ম্মো-নিয়াম-শিক্ষার্থীর কল্যাণে তা কারু অবিদিত নাই। নীতিকথা সেই কারণেই উৎকট। Didactic কবিতা সর্ব্বদেশেই কীদৃশ অনাদৃত তা কার অবিদিত? ম্যাথু আর্নল্ড্‌, বলিয়াছিলেন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের "bags & baggages" কেড়ে নিলেই তবে আমরা প্রকৃত ওয়ার্ড-সোয়ার্থকে পাব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

অবরোধের কথা।

চোখে-দেখা যে খুন সে-খুনের আসামীরও নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু-না-কিছু বল্‌বার থাকে—সুতরাং অবরোধ প্রথার স্বপক্ষেও যে কিছু বল্‌বার আছে, তা আইন আদালত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরাই স্বীকার কর্‌বেন। অবরোধটাকে খুনী আসামী বলে' মান্‌লেও, অবশ্য চোখে দেখা খুন নয়। এ-খুন হচ্ছে আধ্যাত্মিক মেথডে। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক মেথডে যে হত্যা তা চোখে দেখা যায় না। এমন কি হাজার করা ন'শ নিরনব্বই "কেসে" যে মরে, সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না যে, সে মর্‌ছে। সুতরাং পর্দ্দা বিরোধী যাঁরা তাঁরা অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি ওকালতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

(২)

অবরোধ প্রথার বিপক্ষ দল অবরোধের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগ থেকে সকল প্রকারের অলঙ্কার, কবিত্ব, যুক্তিতর্ক, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল রকমের বাহুল্য বর্জ্জন করে' তার একটা চুম্বক করলে যা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই, প্রথমত—

এই অবরোধ প্রথার মধ্যে বঙ্গীয় মহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করেন; দ্বিতীয়ত—সমাজে স্ত্রী-জাতির অবরোধ সমগ্র সমাজের পক্ষে অকল্যানকর। এই দু'টি সিদ্ধান্ত কতদূর ঠিক তা আমাদের দেখ্‌তে হবে।

আমরা আজ সবাই দেশচর্য্যায় ব্রতী সুতরাং সমাজের দিক থেকেই জিনিসটাকে আগে দেখ্‌ব—কেননা ব্যক্তির চাইতে সমাজই হচ্ছে সকলের মতে দেশের বৃহত্তর রূপ। সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে, অবরোধ প্রথাটা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। কিন্তু আমাদের জাতীয় ও সামাজিক দুর্গতির জন্য অবরোধ প্রথা যে কতদূর দায়ী, সে বিষয়ে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা আছে বলেত আমার মনে হয় না।

সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটির প্রতি নজর দেব। সেটা হচ্ছে এই যে, অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করে' থাকেন। দেখ্‌তে হবে কথাটা কতদূর সত্যি।

ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ দাঁড়িয়েছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে instinct প্রবল; মানুষ—কি পুরুষ কি স্ত্রী—instinct-কে ছাড়িয়ে উঠেছে। কথাটা বাঙলা করে' বল্‌লে এই দাঁড়ায় যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি একাধিপত্য কর্‌ছে; কিন্তু মনুষের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে—এবং সে প্রকৃতির উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন কর্‌বার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌ছে। সে যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পেরেছে তা নয়, তবে মানুষ আর পশু নেই। মানবের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে বলে', আপনার অধিকার, আপনার রহস্য জেনেছে বলে' মানবের স্বাধীনতাও বেড়েছে, তার সুখ দুঃখের ফরমুলা বদ্‌লেছে,

তার আশা আকাঙ্ক্ষার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তার সমস্ত জীবনের ভঙ্গিমাটাই একটা নূতন ছাঁচে গড়ে উঠ্‌ছে।

মানবের মধ্যে পুরুষ জাগ্রত হয়েছে বলে' পুরুষ নারীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে—সেই পুরুষের ইচ্ছা শক্তির জোরে। প্রকৃতি হচ্ছে জ্ঞানহীনা। সে পুনরুক্তি ছাড়া, একই জিনিসকে, একই বিষয়কে বার বার একই ভাবে সৃষ্টি করা ছাড়া, আর কিছু পারে না। সেই জন্য দেখি যেখানে পুরুষের আবির্ভাব হয় নি সেখানে প্রকৃতির একই রূপ। বৈদিক যুগের গরুটা থেকে আজকার গরুটার কিছুই প্রভেদ নাই। শিশু যিশুকে পিঠে করে' যে গাধাটা ঈজিপ্টে পৌঁছিয়েছিল, সেটার সঙ্গে আমাদের অতি সাধারণ ধোপার গাধাটার কোনই অমিল নেই। তেমনি সকল প্রকার ইতর প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্ত্তন নেই। পাঁচ হাজার বছর আগে শাল্মলী তরুটা ঠিক যে ভাবে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে যে নিয়মে গড়ে উঠেছে—আজকার শাল্মলী তরুটাও তাই। যে বট গাছটার তলায় শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন সেটাও যা—আর আজকার যে বট গাছটার তলায় পানওয়ালী পানের খিলি বেচ্‌ছে, ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষীরা তামাক খাচ্ছে—সেটাও তাই। কিন্তু এক মানুষের সম্বন্ধেই তা খাটে না। কারণ মানুষের মধ্যে পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, আর এই পুরুষের ইচ্ছা শক্তি বা Will বলে' একটা সম্পদ আছে।

আর সেই জন্যেই মানুষের—কি পুরুষ কি নারীর—সুখ দুঃখ শুধু একটা বাহিরের ধরাবাঁধা অবস্থা বিশেষে নয়, সেটা তার অন্তরের ইচ্ছার সার্থকতা বা ব্যর্থতা। মানুষের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ

subjective, একটা গরুর সুখের অবস্থাও যা, দশটা গরুর সুখের অবস্থাও তাই, দশ-যুগের গরুর সুখের অবস্থাও তাই। কিন্তু মানুষের সুখ তখনই, যখন তার অন্তরের অবস্থা বা মনের বাসনার সঙ্গে বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

উপরে যে কথাগুলো বলা গেল, আশা করি এ সম্বন্ধে সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখন একটা জিনিস নির্দ্ধারণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব, সেটা হচ্ছে অবরোধ প্রথাটা বাঙলায় এল কি করে'। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত ঐতিহাসিক গবেষণা বা অনুসন্ধান কর্‌তে যাচ্ছি—আমার এ অনুসন্ধানের আশ্রয় হচ্ছে অনুমানখণ্ড ইংরেজিতে যাকে বলে—guess-work। এই guess-work এখানে কর্‌তে যাচ্ছি এই সাহসে যে, তার সিদ্ধান্ত যদি তাহা ভুলও হয়, তবে এই প্রবন্ধের মূল কথার কিছুই আস্‌বে যাবে না।

বাঙলাদেশে আজকাল দু'রকমের লোক দেখা যায়। এক দলকে সেই দাঁড়কাকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল। কারণ তার ধারণা ছিল যে, গায়ে ময়ূরপুচ্ছ লাগালেই সে সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। এই দলের মানুষও তেমনি বলে' বেড়ান যে, আমরা হচ্ছি আর্য্য সন্তান। তাঁদের মনের ভাবটা যে, আমরা আর্য্য-সন্তান প্রতিপন্ন হ'লে বর্ত্তমান "আমাদের" মহত্ত্বটাও বিনা ক্লেশে বিনা আয়াসে বেড়ে যাবে। তাই যখন এঁরা শোনেন কেউ বল্‌ছে যে, আমাদের শিরায় মঙ্গোলীয় বা দ্রাবিড় শোণিত আছে, তখন তাঁরা বেজায় খাপ্পা হ'য়ে ওঠেন। অন্যদল এ সবকে কিছুই কেয়ার করেন না। তাঁরা বলেন যে, থাক্‌লেই বা

আমাদের শিরায় দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় শোণিত, আমাদের যা মহত্ত্ব তা কাগজে কলমে দেখালে চল্‌বে না, দেখাতে হবে তা হাতে কলমে। অতীতকে নিয়েই খালি হৈ চৈ কর্‌লে নিজেদের সুখ হ'তে পারে কিন্তু অপরের তাতে ভুল হবে না। কিন্তু যাহোক্ এঁদের এই বাদানুবাদের কোন বিচার আমরা কর্‌ব না—বিশেষত আমরা যখন নৃতত্ত্ববিদ নই। এঁদের দু'দলের মনস্তুষ্টির জন্যে ধরে নেওয়া যাক, বাঙালীর মধ্যে ও-তিন জাতের রক্তই আছে—আর্য্যেরও, মঙ্গোলেরও দ্রাবিড়েরও। এবং এ-কথাটা সত্য হবারও একটা সম্ভাবনা আছে। কেননা ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে বাঙালীর যেমন একটা adaptability আছে—আপনাকে পরিবর্ত্তিত হ'তে দেবার পক্ষে যেমন একটা অসঙ্কোচ ভাব আছে, এমন আর কারও নেই। আর মিশ্র রক্তেরই যে এ রকম চরিত্র হ'য়ে থাকে, এটা নৃতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে অবরোধ প্রথা, তা আর্য্যদের ছিল না; মঙ্গোলীয়দেরও নেই, দ্রাবিড়দেরও নেই। সুতরাং বাঙালী তা পেল কোথা থেকে? এ প্রশ্নে স্বভাবতই একটা উত্তর এসে পড়ে, সেটা হচ্ছে—মুসলমানদের কাছ থেকে।

এ সম্বন্ধে বাঙলাদেশে একটা প্রচলিত মত আছে সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা বঙ্গীয়-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তারই ফল হচ্ছে অবরোধ। কিন্তু অবরোধের এই কারণটা সত্যি নয় বলেই মনে করি। কেন করি—তার কারণ বল্‌ছি।

একথা আমরা সবাই জানি যে, বাঙলাদেশে মুসলমানদের আমলে সমস্ত দেশটা প্রত্যক্ষ ভাবে হাতে ছিল হিন্দুদের। মুসলমান নবাব বছর বছর নিয়মমত রাজস্ব পেলেই তুষ্ট থাক্‌তেন। কিন্তু দেশের

আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ছিল হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের হাতে। শাসন ও পালনের ভার প্রত্যক্ষ ভাবে ছিল তাঁদেরই হাতে। সুতরাং সেই হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের এলাকায় মুসলমানেরা হিন্দু-ললনার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ কর্‌ল আর সমস্ত হিন্দুরা জোট বেঁধে তার প্রতিকার কল্পে বাঙলার সমস্ত নারী সমাজকে একদিন অন্তঃপুরে অন্তরীণ কর্‌ল, এটা মান্‌তে মন সরে না। আর যদি ধরেই নেও যে, মুসলমানরা হিন্দু-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তাহ'লেও ঐ অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে তারা তাদের গায়ের বল, হাতের অস্ত্র, বুকের সাহস—সব ঢেকে রেখে তাদের মা বৌ বোনদের উপরে হুকুম জারি কর্‌ল যে, তাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ—এ যদি হয় তবে সেটা মানুষের সম্বন্ধে একটা ভীষণ রকমের নতুন Psychology বল্‌তে হবে—যা মান্ধাতার আমল থেকে মানুষের চরিত্র দেখে দেখে মানা কঠিন। বিশেষত মুসলমান কেবল বাঙলাদেশেই ছিল না—অন্য প্রদেশেও ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, একথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে, বাঙালী যদি মুসলমানদের কাছ থেকেই অবরোধ প্রথা পেয়ে থাকে, তবে সেটা সে পেয়েছে ভয়ের ভিতর দিয়ে ততটা নয়, যতটা ভক্তির ভিতর দিয়ে।

সে যাহোক্, ঐ যে ভাদুড়ী বংশের রাম ভাদুড়ী যিনি নবাবের অমুখ পরগণার দেওয়ান, বছরে মাইনে পান হাজার মোহর, দু-পা যেতে হলে যাঁর পাল্কী চাই, যাঁকে দেখে সাধারণ অসাধারণ গণ্য নগণ্য সবাই তটস্থ, তাঁর গৃহিণী কাত্যায়নী দেবীর ব্যবহারটা হওয়া চাই নবাব অন্তঃপুরবাসিনীদের মতো; কারণ সেইটেই যে আভিজাত্যের চিহ্ন, সেটাই যে বড়মানুষী চাল। তাই কাত্যায়নী দেবীর

মাথায় অবগুণ্ঠন চড়্‌ল। আর এই অবগুণ্ঠনের দুঃখের চাইতে একটা বড় সুখ কাত্যায়নী দেবীর মনে বাসা বাঁধল—সেটা হচ্ছে, ঐ আভিজাত্যের গর্ব্ব—তিনি যে বড়ঘরের গৃহিণী সেই অনুভবের সুখ। আর এই সুখই কাত্যায়নী দেবীর আসল সুখ, কেননা আগেই বলেছি যে, মানুষের সুখ হচ্ছে তার অন্তরের বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা, আরও বলেছি যে, মানুষের অন্তরের এই বাসনার পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে—তার ইচ্ছাশক্তির জোরে। সেইজন্যে মানুষের সুখ দুঃখ তার বাহিরের কোন অবস্থা বিশেষই নয়।

বাস্তবিক এ সত্যের উদাহরণ জগতে অসংখ্য মেলে। চীনে-রমণী যে লোহার জুতো পরে' পা ছোট করে' রাখে, যে-পা দিয়ে অবশেষে হাঁটাই যায় না, এর পিছনে রয়েছে চীনে-রমণীর পা ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌ছে—এই মনোভাব। এইজন্যে পা ছোট হওয়ার দুঃখ, হাঁটতে না পারার দুঃখ, তার দুঃখই নয়। আমি নিজ চোখে দেখেছি একটি ছোট মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে হাতে উল্কি পর্‌বার কালে। কিন্তু হ'লে হবে কি?—ঐ উল্কির সাথে সাথে যে, তার হাতখানি সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে, এই মনের ভাব মেয়েটিকে এমন একটা জগতে নিয়ে ফেলেছে, যেখানে শরীরের ব্যথা মোটেই আসন পায় না। হাতটা কাঁধ থেকে নীচের দিকেই নামা যে সুখের, তার প্রমাণ আবশ্যক করে না। কিন্তু ঊর্দ্ধবাহু যে, সেই হাতখানাকে উঁচু করে' ধরে তাকে শুকিয়ে ফেল্‌ল, তার পিছনে ঊর্দ্ধবাহুর মনের এই সুখটা রয়েছে যে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্মজীবন লাভ হচ্ছে—ভগবানের কাছে যাবার পথ সরল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এমনি করেই হয়ত সেকালের ধনী-গৃহিণীবৃন্দের মাথায় অবগুণ্ঠন চড়্‌ল, তাদের অন্তঃপুরের দরজা জানালা বন্ধ হ'ল। আর তারপর "মহাজনো যেন গত স পন্থা" না মান্‌লেও ধনীলোকেরা যা করেন নির্ধনেরাও যে তাই করেন, অন্তত কর্‌তে চেষ্টা করেন এ সত্য আজও দেখা যায়। সুতরাং ঐ ফ্যাসান ক্রমে ক্রমে দেশে ছড়িয়ে পড়্‌ল—এবং দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে শতাব্দীতে শতাব্দীতে ওটা দেশের মাটী ও নারীর মনকে এমনি করে' জড়িয়ে ধরল যে, অবশেষে বঙ্গীয় মহিলাদের ওটাই সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল—সুতরাং এইটেই সুখের হ'য়ে উঠ্‌ল।

তারপর সুখ দুঃখের কথা। আসলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাক্‌ না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখ সৃষ্টি করে' বসে। কারণ সুখ দুঃখটা মানুষের মনের ধর্ম্ম। মন যতদিন আছে, ততদিন সে যেখানেই যে-অবস্থাতেই থাক্‌ না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখের আশ্রয় খুঁজে নেবে। মিস্ পাঙ্ক্‌হার্স্‌টের দুঃখ—নারীর ভোটে অধিকার মিলছে না বলে', শ্রীমতী শতদলবাসিনীর দুঃখ—তার দড়াহারটা ঠিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ের মতো হয় নি বলে'। যদি বল যে, মিস্ পাঙ্ক্‌হার্স্‌টের মধ্যে রয়েছে নারীর পূর্ণতর রূপ, পূর্ণতর প্রকাশ। তাহোক্‌। শতদলবাসিনী আজ যা, তার কাছে নারীর ঐ পূর্ণতার রূপ বা প্রকাশের কোন মূল্যও নেই মানেও নেই। সে এখন যা, তার কাছে মিস্ পাঙ্ক্‌হার্স্‌টের ভোট না পাওয়ার দুঃখ পাগ্‌লামি, আর মিস্ পাঙ্ক্‌হার্স্‌ট আজ যা, তার কাছে শতদলবাসিনীর দড়াহার সম্বন্ধীয় দুঃখ ছেলেমানুষী। আমি আগেই বলেছি যে মানুষের সুখ দুঃখ subjective, আসলে

সুখ দুঃখ বাহিরেও আছে, ভিতরেও আছে। বাঙালীর অন্তঃপুরেও হাজার হাজার সুখী গৃহিণী মিল্‌বে। সুতরাং অবরোধের ভিতরে দুঃখের একচেটে কার্‌বার—এ কথাটা ঠিক নয়, আর বাহিরে সুখের অবিরাম হিল্লোল, এত বড় মিথ্যে কথাটাও আজ আমরা বাঙলার নারী-সমাজকে বল্‌তে পার্‌ব না।

অবরোধের বিরুদ্ধে যে দুই অভিযোগের কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি, সে দুই অভিযোগ থেকে অবরোধকে বাঁচাতে হ'লে এই সব কথাই বলা চল্‌তে পারে।

(৩)

আমরা অবশ্য অবরোধের স্বপক্ষে নই। আমরা নারীর অবরোধের বিরুদ্ধে এইজন্যে যে, যেমন পুরুষ তেমনি নারী তার পক্ষে দেহ বা মনের রুদ্ধ অবস্থা একটা ঘোর মিথ্যা অবস্থা। সাংসারিক সুখ দুঃখের চাইতেও মানুষের কাছে তাঁর আত্মা বড়, অবরোধ প্রথা নারীর আত্মাকে খর্ব্ব করে বলে'ই তা অসহ্য।

আসলে বাঙলার পুরুষ যেমন কেরাণীগিরি কর্‌বার জন্যেই জন্মে নি—বাঙলার নারীও তেমনি শাস্ত্রবাক্য "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যাঃ" সত্ত্বেও কেবল গর্ভধারণের জন্যেই জগতে আসে নি। আকাশ বাতাসের সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ, নারীরও সেই সম্বন্ধ। আমরা জন্মেছি এই জগতে। ভগবান আমাদের প্রাণ দিয়েছেন নড়্‌বার চড়্‌বার জন্যে—চোখ দিয়েছেন, কৌতূহল দিয়েছেন—খুঁড়্‌বার খুঁড়্‌বার জন্যে। কিন্তু এই খোলা জগতটা নারীর জন্যে একেবারে

বন্ধ-পুঁথি করে' রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী, আর যেই হোন্—স্বাধীনতার মর্ম্ম যাঁরা একটুকুও অনুভব করেন তাঁরা হবেন না। আর ঐ হচ্ছে সবার চাইতে বড় যুক্তি।

যেটা মানুষের চোখে চোখে থাকে, সেই জিনিসটাই তার চোখে পড়ে না। সেই রকম, যে আচার ব্যবহারগুলো নিয়ে আমরা ঘরকন্না করি, তার কোন কোনটা ঘোর বীভৎস হলেও সেই বীভৎসতাটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন একটুখানি নিজেকে আল্‌গা করে' দেখ্‌বার চেষ্টা করি—পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মনকে, আজন্মের সংস্কার থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে' সহজ স্বাভাবিক চোখে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, তখন অদম্য হ'য়ে মনের পাতায় এই ভাব ফুটে ওঠে—কি অমানুষিক অত্যাচার! আমাদের মতোই রক্তমাংসের জীব, আমাদের মতোই যাদের মন আছে, বুদ্ধি আছে, কৌতূহল আছে, চোখ আছে, তাদের এ জগতটাকে সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বার অধিকার নেই। যদি নেহাৎ তারা দেখতে চায় ত চোখের সাম্‌নে ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে। যখন ঐ চার দেয়ালের কথা স্মরণ করি তখন নিজেরই নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌বার মতো হয়। যদি বল যে, তোমার কাব্যি-কল্পনা রাখ, বঙ্গ-নারীর ও-রকম কারও নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে না। তবে বলি যে, ঐ ত সবার চাইতে বড় দুঃখ, "হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু তাদের মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে"। আর এই পাথরের মুঠোকে চিরন্তন কর্‌বার জন্যে আমরা কেউ কেউ দেই যুক্তি এবং এই মুঠোকে আল্‌গা করবার জন্যে আমরা কেউ কেউ করি তর্ক। আমাদের যুক্তি তর্কের আর শেষ নেই।

কিন্তু নারীও যে পুরুষের মতো এ জগতের বুকে খোলা চোখে, মুক্ত মনে বিচরণ কর্বে, এটা এত সাদা রকমের সত্য যে, এর কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে। আসলে যখন সত্যকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাই, তখনই সত্যকে খাটো করি। সত্য সব সময়েই নিজগুণেই সত্য।

অবরোধকে চিরন্তন করে' রাখ্‌বার জন্যে যাঁরা অনেক অনেক যুক্তি দেন, তাঁদের একটা যুক্তি কেবল একটু প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, অবরোধের ঐ পাথরের মুঠোকে আল্‌গা কর্‌লে, সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়্‌বে—চরিত্রহীনতা বাড়্‌বে।

প্রথমত—এ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। এই ভারতবর্ষেই তামিল বলে' এক জাতি আছে। কি হিন্দু, কি ক্রিশ্চিয়ান তাদের নারী-সমাজে অবরোধ প্রথা নেই। কিন্তু তাই বলে' তাদের সমাজ ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে যায় নি—তাদের সমাজ বিশৃঙ্খলায় ত উশৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয়ত—মানুষকে যতটা প্রকৃতিগত উশৃঙ্খল বলে' ধরে' নেই—মানুষ ঠিক ততটা উশৃঙ্খল নয়। মানুষের দেহ ছাড়িয়ে প্রাণ, প্রাণ ছাড়িয়ে মন, মন ছাড়িয়ে আত্মা। মানুষ তার দেহ থেকে যাত্রা সুরু করে' আত্মার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজকার মানুষ প্রায় মনের কাছকাছি এসে পৌঁছেচে। এই মনকে শিক্ষা দিয়ে শিষ্ট করা যায়। আর এই মনকে শিক্ষা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষকে চরিত্রবান করাই হচ্ছে পাকা কাজ। স্ত্রী-পুরুষকে আলাদা রেখে তাদের চরিত্রবান করা হচ্ছে গোঁজামিল। গোঁজামিলের পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁজা মন তাদের কোন দিনই লাভ হবে না। তবে পুরুষের মধ্যে শতকরা এক শ' জনাই যেমন ভীষ্ম হবেন না—তেমনি নারীর মধ্যেও শতকরা এক শ' জনাই সাবিত্রী হবেন না। মানুষের কিছুই চৌকষ হয় না—তার আর কি করা যাবে? কিন্তু এই চৌকষ না হবার মানেও আছে; কারণ যে অনুষ্ঠানের যেখানে চৌকষ নয় ঠিক সেই খানটায় তার অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত।

আসলে বুরোক্রেসি আজ আমাদের ঠিক ঐ কথাটাই বল্‌ছে। তারা বল্‌ছে যে, তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন পেলে দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলা হবে। আমরা কিন্তু সেটা মোটেও মান্‌ছি নে। আর আমাদের এই না-মানাটা ঐ বিশৃঙ্খলা-যুক্তির চাইতে বড়।

ঠিক তেমনি আজ যদি কয়েকজন বিদুষী বঙ্গীয়-মহিলা প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলার পুরুষের পার্লিয়ামেণ্টে এক আর্জ্জি পেশ করেন—বঙ্গনারীর পর্দ্দা তুলে দেবার জন্যে, আর আমরা যদি ঐ বিশৃঙ্খলার দোহাই দেই, তবে সেটাও কি ঠিক ঐ জাতীয় যুক্তি হবে না?

আসল মেয়েরা স্বাধীনতা পেলে যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার বাড়ে, তবে তা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে সমাজকে অন্য উপায় খুঁজে বের কর্‌তে হবে। ঐ আজুহাতে মানুষের প্রতি ভগবানের প্রথম দান যা—চোখ মেল্‌বার অধিকার—চোখ মেলে এই জগতটাকে সহজ রূপে দেখে নেবার অধিকার—তা থেকে স্ত্রী-জাতিকে অনন্ত যুগ বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌তে চায় যে, সে বর্ব্বর না হোক, ঘোর স্বেচ্ছাচারী—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে' despot. এই despotism কি আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী হবে?—আজকের দিনে এ কথা বিশ্বাস করা আহম্মকি।

(৪)

কিন্তু আজ বঙ্গীয়-নারী-সমাজের পক্ষে সবার চাইতে আরামের খবর যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার পুরুষ-সমাজের সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে নি। তা যদি হ'ত আর বাঙলার সকল পুরুষ যদি তাঁদের আত্মীয়াদের অবগুণ্ঠন টেনে ছিঁড়ে তাঁদের দীপ্ত আকাশের তলে নিয়ে আস্‌তেন তবে সেই আত্মীয়াদের আজ লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌ত না। কেননা কোন জিনিসকেই বাহির থেকে পাওয়াই সত্য করে' পাওয়া নয়। ভিতরে যে সত্যের চিহ্ন-মাত্র নেই বাহিরের সেই সত্যের অনুযায়ী আচরণ কর্‌তে গেলে দুঃখই হয়, কারণ সেটা হচ্ছে তখন পরধর্ম্ম।

সুতরাং হাজার কাজ, হাজার চিন্তা, হাজার অনুষ্ঠানের মাঝে আজ যেন আমরা এই কথাটাকে অস্বীকার না করি যে—সত্যই সুন্দর, সত্যই শোভন, সত্যই সহজ। যতক্ষণ এই সত্যকে আমরা অন্তরে গড়ে' তুল্‌তে না পার্‌ব, ততক্ষণ সে-সত্যকে আমরা বাইরে সার্থক করে' তুল্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না। আসলে কোন সত্যই বাহির থেকে পড়ে' পাওয়া যায় না', অন্তর থেকে গড়ে' তুল্‌তে হয়। জীবনে যেখানেই আমরা এই সত্যটাকে অস্বীকার কর্‌ব, সেখানেই আমাদের পরিণামে ঠক্‌তে হবে।

কাজেই আমাদের সমাজের অন্তরে স্বাধীনতা আগে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'বে—তখনই বাহির স্বাধীনতার পক্ষে সহজ হবে, সত্য হবে ও সুন্দর হবে।

এর জন্যে চাই স্ত্রী-পুরুষের মনের গঠন-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন—তাদের শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের বিসর্জ্জন, আর তা হবে শিক্ষার ভিতর দিয়ে।

শিক্ষার ভিতর দিয়ে যখন মন, চিত্ত মুক্ত হ'বে তখনই বাহিরের স্বাধীনতা অমৃতময় হবে। কারণ এ প্রবন্ধের আগেই আমি বলেছি যে, মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দ তখনই, যখন তার ভিতরের অবস্থার সঙ্গে তার বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

কিন্তু সবার চাইতে মানুষের সত্য যা—তার স্বাধীনতা—তার চোখ মেলে সহজ ভাবে এই পৃথিবীর বুকে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াবার অধিকার—সেই অধিকারকে যে মানুষের জীবনে—তা সে মানুষ পুরুষই হোক বা নারীই হোক্—শিক্ষা দিয়ে সত্য করে' তুল্‌তে হয়—এর চাইতে মানুষের-জীবনে বড় পরিহাসের কথা আর কিছুই নেই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। *

১

রাত পোহালো—শুন্‌ছ সখি, দীপ্ত ঊষার মাঙ্গলিক ?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক !
পূব গগনের দেব-সবিতার স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
পড়্‌ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির।

২

স্বপ্নে যেন কণ্ঠ শুনি—রাত্রি জানি শেষ প্রহর—
পান্‌শালে মোর দৈববাণী—কর্ণেতে কার বাজ্‌ল স্বর !
বল্‌ছে হেঁকে—ওঠ্‌রে বাছা, ভরিয়ে নে তোর পেয়ালাটুক,
জীবন-সুরা শুকিয়ে না যায়, আপশোষে ফের ফাট্‌বে বুক !

---

* পারসী কবি ওমর খৈয়ামের কবিতার একটি বিশেষ গুণ এই যে, যিনি তা পড়েন তাঁরই তা অনুবাদ কর্‌বার লোভ হয়। ইউরোপে এমন ভাষা নেই যাতে ওমর খৈয়ামের রুবেইয়াতের অনুবাদ নেই। শুধু তাই নয়, প্রতি ভাষাতেই তার নানা হাতের অনুবাদ আছে। বহু লেখক বাঙলা ভাষাতেও ওমার খৈয়ামের কবিতা অনুবাদ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু সে আংশিকভাবে। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ রুবেইয়াৎ-গুলো আগাগোড়া তর্‌জমা করেছেন—এই জন্য বাঙলার পাঠক সমাজের কাছে সে-গুলি উপস্থিত কর্‌ছি।

সম্পাদক।

৩

রুদ্ধ-দুয়ার পানশালাটির সামনে সে কি হট্টগোল,
ভোরের ডাকে বলছে কারা,—খোল্‌ রে ওরে দুয়ার খোল !
কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুটছে আয়ু ব্যস্ত পায়,
বিদায় নিলে ফিরব না আর—অন্তহীন যে সেই বিদায়।

৪

নওরোজেতে সেই পুরাতন ব্যর্থ যত মনের আশ
উঠ্‌ছে কত ভাবুক মনে, দিচ্ছে মোড়া স্মৃতির পাশ।
কোন্‌ দুখেতে যায় সে চলে' কোন্‌ নিরালা বনের মাঝ,
ঈশার শ্বাসে গুল্মলতার নবীন যেথা পত্র-সাজ।

৫

ঈরাম্‌ নিয়ে পালিয়েছে তার গর্ব্ব যা' সব গুল্‌-বাহার,
জাম্‌শিয়েদের খাস্‌-পেয়ালা—কোথায় গো আজ চিহ্ন তার !
তবু দ্রাক্ষা-বুকে তেমনি আজও জ্ব'ল্‌ছে চুনীর রক্তহার,
আর খুঁজ্‌লে আজও মিল্‌বে না কোন্‌ ফুল-বাগিচা নদীর ধার !

৬

দায়ুদ সাথে ফুরিয়েছে আজ সব পুরাতন ছন্দ-ফের,
বুলবুলেরি কণ্ঠে শুধু বাজ্‌ছে ভাষার সাবেক জের।
সেই সুরেতে চাইছে সে আজ গোলাপসখীর বর্ণ লাল—
রক্ত-রাঙা দ্রাক্ষাসারে রাঙিয়ে নিতে হলুদ-গাল।

৭

আজ ফাগুনের আগুন-জ্বালে হুতাশ-বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সে সব ছাই ক'রে দাও—দাও আহুতি দুখের শ্বাস!
আয় বিহগ—খোঁজ রাখ কি—মেলিয়ে ডানা উড়্‌ল হায়,
পেয়ালাটুকু শেষ করে' নাও, এক চুমুকেই ফাগুন যায়!

৮

কতই না আজ ফুল ফুটেছে, অযুত বরণ, ঊষার মাঝ,
লক্ষ ফুলের সমাধি'পর—তাদের স্মৃতি তুচ্ছ আজ!
এই ফাগুনের ফুলের বাসে দেখ্‌বে কোথা তলিয়ে যান
জাম্‌শিয়েদের অতীত স্মৃতি, কৈকোবাদের জীবন-গান!

৯

ভাগ্যলিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা' ফুরিয়ে যাক্;
কৈকোবাদ আর কৈখস্‌রুর ইতিহাসেই নামটা থাক্।
রুস্তম আর হাতেম তায়ের কল্পকথা স্মৃতির ফাঁস—
সে সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এসো আমার পাশ।

১০

আমার সাথে আস্‌বে যেথায়—দূর সে রেখে সহর গ্রাম—
এক ধারেতে মরু তাহার, আর এক দিকে শষ্প শ্যাম।
বাদ্‌শা-নফর নাইক সেথা—রাজনীতির চিন্তাভার;
মামুদশাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁরে নমস্কার।

১১

সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি, মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর!

১২

রাজ্যসুখের আশায় বৃথা কেউবা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গসুখের কল্পনাতে পড়্‌ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।.........
নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?—মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

১৩

সদ্য-ফোটা এই যে গোলাপ, গন্ধ-প্রীতি-উজল-মুখ,
ব'ল্‌ছে না কি—মিথ্যা এ সব, এই ক্ষণিকের দুঃখসুখ!
পৃথ্বী-বুকে উঠ্‌ছি ফুটে গর্ব্বে পরি' রঙীন্ সাজ—
পাপ্‌ড়ি টুটে ছড়িয়ে মোদের জীবন-রেণু পথের মাঝ!

১৪

কুহক-রাণী আশার পিছে দিল্‌টা ফিরে সর্ব্বদাই,
স্বপ্ন কারু সত্য বা হয়, কার ভাগে বা উঠ্‌ছে ছাই!
সব ক্ষণিকের—আসল ফাঁকি—সত্য মিথ্যা কিছুই নয়—
মরুর 'পরে তুষার মতো চিক্‌মিকিয়ে পায় সে লয়।

১৫

জীবন-জমির 'পরে যারা যত্নে বোনে সোনার বীজ,
হাওয়ায় বুনে ফুৎকারেতে কর্‌ছে যারা সব খারিজ ;—
খতম যে সব এইখানেতেই—বীজ না ফলে পুনর্ব্বার,
গোরের ভিতর যে জন, সে কি জীবন নিয়ে ফিরবে আর !

১৬

জীর্ণভাঙ্গা সরাই-খানার রাত্রি দিবা দুইটি দ্বার,
তারির ভিতর আনাগোনা—দুনিয়াদারি চমৎকার !
রাজার পরে আস্‌ছে রাজা, সজ্জা কতই বাদ্য ধূম—
তুচ্ছ সে সব—কয়দিনই বা ?—তার পরে তো সব নিঝুম !

১৭

জাম্‌শিয়েদের পেয়ালা-মুখর্ খাস্-দেয়ালের খিলানমাঝ
বাস বেঁধেছে আজকে সেথায় টিক্‌টিকি আর সিংহরাজ !
রাজার সেরা রাজ-শিকারী বরাম্ কোথায় ঘুমিয়ে রয়—
আজকে তো তার মাথার 'পরে চাট্ মেরে যায় বন্য-হয় !

১৮

দার্ণ-হিয়া কোন্ সে রাজার রক্তে-নাওয়া এই গোলাপ—
কার দেওয়া সে লাল্‌চে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত-ছাপ !
ফুল-বাগিচায় ওই যে ফোটে রঙের বাহার আশ্‌মানির—
কোন্ রূপসী সীমন্তিনীর সুনীল আঁখির দৃষ্টি স্থির !

১৯

আর এই যে কোমল দূর্ব্বা গো, যার বুকের ঘেরা আঁচল টুক্
সন্তশীতল শয়ন মোদের—সবুজিয়েছে নদীর মুখ—
আস্তে সখি পাশ ফিরে নাও—কি জানি এর ব্যথার ফের—
কোন্ রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ান্-রসে জন্ম এর !

২০

অতীত যা' তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্-পিয়ারা শাকী গো আজ পেয়ালা ভরে' ঘুচাও মোর।
আসছে যে কাল, তার কথা থাক্—মিশ্‌ব গিয়ে হয়ত আজ
তুচ্ছ স্মৃতির সৌরভেতে লক্ষ অতীতকালের মাঝ !

২১

গর্ব্বে যারা বইত শিরে ভাগ্যদেবীর আশীষ্-ভার,
বক্ষে যাদের দুলিয়েছিনু সর্ব্ব স্নেহপ্রীতির হার ;—
আজ দুনিয়ায় কোথায় তারা ?—পেয়ালাটুকু আর সবার
একটু আগে শূন্য ক'রে ঘুমিয়ে ঘোচায় শ্রান্তি-ভার !

২২

স্ফূর্ত্তি যে আজ ক'র্‌ছি মোরা সেই পুরাতন ঘরের মাঝ,
বসন্ত সেই দিচ্ছে বাহার—নূতন ফুলের রঙীন্ সাজ ;—
ভাগ্যে সবার সেইতো লিখা—মাটীর নীচে মরণ-পুর,
পুনঃ মোদের পরে ক'র্‌বে কারা সেই পুরেতে শ্রান্তিদুর !

২৩

মিশ্‌ব ধূলোয়—তার আগেতে সময়টুকুর সদ্‌-ব্যাভার
স্ফূর্ত্তি ক'রে নাই করি কোন্—দিনকয়েকেই সব কাবার।
পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাব মৃত্যু-পারের কোন্ সে দেশ—
সেথা নাইকো সুরা, নাই সুকণ্ঠ—সেই অজানার নাইকো শেষ!

২৪

সত্য ফলের আশায় মোরা মর্‌ছি খেটে রাত্রিদিন,
মরণ-পরের ভাব্‌না ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হ'তে মুয়েজ্জিনের সাড়া পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই!

২৫

তর্ক তুলে কর্‌ত যারা দ্যুলোক ভূলোক নস্যসাৎ—
কোথায় তাদের কণ্ঠ আজি—নির্ব্বিবাদে কিস্তিমাৎ?
বিধান তাদের ফুৎকারেতে উড়িয়ে সবাই দিচ্ছে আজ,
আর মুখটি তাদের ধূলোয় ঠাসা—বন্ধ এখন জিভের কাজ!

২৬

বচন-বাগীশ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞভাবে নাড়ুক শির,
স্মরণ রেখো বন্ধুগো মোর—জীবন কভু নয়কো স্থির।
এই কথাটাই সত্য ভেবে, বাকী যা' সব মিথ্যা, ভুল;
স্বজন-বোঁটায় আর ফোটে না, ঝরলে পরে আয়ুর ফুল!

২৭

কতই না সে মাড়িয়ে আসা পণ্ডিতেদের টোলের দোর,
বয়স তখন নেহাৎ কাঁচা—কাজটা শোনা তর্ক ঘোর;
বিচার-ঘটে বিশ্ব পোরা—মুণ্ডমাথা নাইকো যার—
তর্ক-ধাঁধার ফির্‌তি-দুয়ার—ঠিক্ যেথা তার প্রবেশ-দ্বার!

২৮

তাদের সাথে ক'র্‌নু রোপন বীজটি গোপন জ্ঞান-তরুর,
জলটি সেচন আপন হাতে—ফল্‌ল ফসল হৃদ্-মরুর;
যত্নে সে মোর চায়নে করা জ্ঞান-ফসলের অর্থ-জের—
স্রোতের মতই ভাস্‌তে আসা, হাওয়ার সম উধাও ফের।

২৯

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে—হেথায় বা মোর কিসের কাজ!
কোথায় পুনঃ—কেই বা জানে—ফির্‌তে হবে কোনও দিন—
উধাও সে কোন্ মরুর 'পরে হাওয়ার মতন লক্ষ্যহীন!

৩০

কোথায় ছিলাম, কেনই আসা—এই কথাটা জান্‌তে চাই,
জন্ম-কালে ইচ্ছাটা মোর কেউ তো কেমন সুধায় নাই!
যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে?—প্রশ্নটা মোর মাথায় থাক—
ভাগ্যদেবীর ক্রূরপরিহাস পেয়ালা ভ'রে ভোলাই যাক!

৩১

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগ্রহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রিদিন।
বিদ্যাটা মোর উঠ্‌ল কেঁপে, কাট্‌ল কত ধাঁধাঁর ঘোর—
শুধু মৃত্যুটা আর ভাগ্য-লিখন, এই দুটো গোল লাগ্‌ল মোর!

৩২

রুদ্ধ-দুয়ার সৃজন-ঘরের কুঞ্জিকাঠির নাইকো খোঁজ,
দেখ্‌তে না পাই ভাগ্য-বধূর ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখ-সরোজ;
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুন্‌ছি শুধু নামটা মোর—
কয়দিনই বা?—সাঙ্গ তো হয় সর্ব্বনামের নেশার ঘোর!

৩৩

তিমির পথের যাত্রী মোরা—দীপ্ত আশার রশ্মি কই?
মর্ত্ত্যে হ'য়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে চাহিয়া রই।
কর্ণে পশে দৈববাণী—কোথাও যে নেই আলোক-পথ,
অন্ধ-নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় বিশ্বনেমির ভাগ্যরথ!

৩৪

তখন আবার মুখটি চুমি মাটীর গড়া পেয়ালাটির,
সুধাই তারে—রহস্যটার অর্থ সে কি খুব গভীর?—
অধর 'পরে রাখ্‌তে অধর, বাজ্‌ল কানে অস্ফুট স্বর—
য'দিন বাঁচো পান ক'রে নাও, ফিরবে না আর মরণ পর!

৩৫

এই যে আমার পেয়ালা-বঁধু জীবন-সাড়া দিচ্ছে আজ—
কোন্ অতীতের সাক্ষী এ জন, কোন্ সেকালের স্ফূর্ত্তিবাজ!
আজ পরিচয় ভিন্নরূপে—মৃত্যু-শীতল মাটীর চাপ—
তবু স্মৃতির নিশান নাই কি আঁকা ওই অধরে চুমোর ছাপ!

৩৬

সাঁঝের ঝোঁকে দেখ্‌নু সেদিন হাটের মাঝে কুম্ভকার
নিঠুর হাতে ঠাস্‌ছে সে এক পিণ্ড ভিজা মৃত্তিকার।
মাটীর ঠোঁটে ফুট্‌ল বাণী—আওয়াজটা তার বেজায় ক্ষীণ—
আস্তে ভায়া আস্তে পেশো, নেহাৎ এ'জন ভাগ্যহীন!

৩৭

পেয়ালাটুকু ভরিয়ে নেগো, এতই কিসের চিন্তা তোর?
সময়টা সব কাট্‌ছে বৃথা—ভাব্‌না কি তাই দিনটা ভোর!
একটা 'কাল'তো মরণ-পারে, আস্‌ছে যে 'কাল' কোথায় 'আজ'?
তাদের কথা ভাব্‌চি ব'সে এই ক্ষণিকের স্ফূর্ত্তি মাঝ!

৩৮

এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মাঝে তোর—
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর্ শেষ নিমেষটা নেশায় ভোর!
আয়ুর তারা প'ড়ছে খ'সে মরণ-উষার চরণ'পর—
যাত্রা যে আজ ক'র্‌তে হবে—ফুরিয়ে নে সব, ত্বরিৎ কর্।

৩৯

কোন্ সে রসের আশায় বঁধু ম'রছ ঘুরে রাত্রিদিন—
ঘূর্ণী পথের নাইক সীমা, অনন্ত সে কোথায় লীন।
সে-সব ছেড়ে স্ফূর্ত্তি কর, দ্রাক্ষারসে হও বিভোর,
ব্যস্ত তুমি যে রস আশে—মিথ্যা, নাহয় তিক্ত ঘোর!

৪০

জানিস্ তো সব বন্ধু তোরা—কাণ্ডটাই বা কয়দিনের—
মোর বাস্তুভিটায় উথ্‌লে ওঠা নূতন বিয়ের স্ফূর্ত্তি-জের।
বন্ধ্যা-প্রিয়া যুক্তিদেবী, সেই রাতে তার নির্ব্বাসন,
আর সেই বাসরে নূতন বধূ আঙুরলতার সম্ভাষণ!

৪১

অস্তি-নাস্তি শেষ ক'রেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।
বিদ্যারসে যতই ডুবি—মনটা জানে মনে স্থির—
মোর দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রস-জ্ঞানটা নয় গভীর!

৪২

এই তো সেদিন সাঁঝের বেলা, পেয়ালা হাতে, গোপন পায়
স্বর্গ-দূতী এল সে মোর মুক্ত-দুয়ার পানশালায়;
ব'ল্‌লে মোরে—পাত্র-সুধায় চুমুক দে' নাও একটি বার—
দেখ্‌নু চেখে—আর কিছু নয়, সেই পুরাতন দ্রাক্ষাসার!

৪৩

সেই পুরাতন দ্রাক্ষা গো—তার ন্যায়-বিধানের হউক্ জয়,
অমোঘ যাহার সূত্রেতে হয় সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়।
আঙুর-চোয়া অল্‌কিমিয়া রসের সেরা রসান্-ভূপ,
জীবন-কাঁশার পাত্রখানা স্পর্শে ধরে সোনার রূপ!

৪৪

সেই পুরাতন দ্রাক্ষাবঁধু—মামুদশাহের মতন যেই,
দুঃখ-কাকের মূর্ত্তিগুলোয় বারদরূপে তাড়ায় সেই।
ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রটি যার দীর্ণ করে সকল ভাণ,
আত্মারে যে করায় পুনঃ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান!

৪৫

বিজ্ঞ যিনি বিজ্ঞ আছেন—তর্ক নিয়ে থাকুন ঘোর,
সৃষ্টি-বিচার, তত্ত্ব-কথা ঘুচিয়ে এস সঙ্গে মোর।
একটি কোণে ব'স্‌ব দোঁহে, হট্টগোলের ঢের তফাৎ,
ভাগ্য—যাহার খেল্‌না মোরা—ক'র্‌ব তারেই পাত্রসাৎ!

৪৬

ঊর্দ্ধে, অধঃ, ভিতর, বাহির, দেখ্‌ছ যা' সব—মিথ্যা ফাঁক—
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।
পৃথ্বীটাতো মায়ার খেয়াল—সূর্য্য-বাতির ফানুস-খোল—
ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তার ক'র্‌ছি গোল!

৪৭

রক্ত অধর এই যে চুমি, পান করি লাল মদির টুক—
মিথ্যা এ সব শূন্য স্বপন—আপ্‌শোষে তাই ফাট্‌বে বুক ?
কাল্‌টা অসীম শূন্যে ঘোরে, শূন্যে ঘেরা মায়ার জাল—
শূন্যে খেলা শেষ ক'রে আজ মিশ্‌ব নাহয় শূন্যে কাল।

৪৮

নদীর ধারে ফুট্‌বে যবে, ফুট্‌বে গোলাপ রঙ-বাহার—
পিওগো এসে কবির সাথে রক্ত-রাঙা দ্রাক্ষাসার ;……
কাল্‌-সাকীটি পেয়ালা ভ'রে আস্‌বে যবে সর্ব্বশেষ—
নিওগো তাহা হাস্য-মুখে, বিনা দ্বিধার চিহ্নলেশ।

৪৯

ছকটি আঁকা সৃজন-ঘরের, রাত্রি দিবা দুই রঙের,
নিয়ত্‌-দেবী খেলছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি সব ঢঙের।
প'ড়্‌ছে পাশা, ধ'র্‌ছে পুনঃ, কাট্‌ছে ঘুঁটি, উঠ্‌ছে ফের—
বাক্সবন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে খেলার জের।

৫০

নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন—যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেল্‌ছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য-খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—জয়-পরাজয় তাঁরই হাত।

৫১

ললাট 'পরে নিয়ত্‌ দেবীর ভাগ্যলিপির হস্তছাপ,
উঠ্‌বে না সে—চেষ্টা বৃথা, মিথ্যা এ সব মনস্তাপ।
উঠুক না সে গভীর শ্বাস, আর ক'ল্‌জে-ফাটা অশ্রুধার—
ভাগ্যদেবীর হস্তটি না ধ'রবে লেখন পুনর্ব্বার।

৫২

মাথার পরে উপুড়-করা পেয়ালা, যারে স্বর্গ কয়,
যার নীচেতে চুপটি করে চক্ষু বুজে দিনটা বয় ;
হস্ত জুড়ে তার কাছেতে চাইছ কিবা ভাগ্য-দীন ?
নিয়ত্‌-সুতোয় বদ্ধ ও-যে, তোমার মতই শক্তিহীন !

৫৩

মৃত্তিকাতে তৈরী যেদিন মূর্ত্ত মানব পৃথ্বীতল,
সেই মাটীতেই বীজটি বপন—ভবিষ্যে যা ধ'রবে ফল।
সেই সৃজনের প্রথম ঊষার ভাগ্যলিপির অঙ্কপাত
ফুটবে পুনঃ শেষ বিচারের প্রলয়-ঊষার জন্মসাথ !

৫৪

তোমায় না হয় ব'লেই রাখি—প্রথম যেদিন যাত্রা মোর,
চোখের জলে বিদায় নিয়ে পেরিয়ে এনু স্বর্গ-দোর ;
কোন্ শাপেতে হেথায় আসা, ভাগ্য-দেবীর অনুজ্ঞায়—
আস্‌তে পথে দেখ্‌নু যে মোর অস্থিতে কার চিহ্ন ভায়।

৫৫

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটী—তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর—দরবেশী-সাঁই যাই বলুন ;
গগন-ভেদী চীৎকারে তাঁর খুল্‌বে নাকো মুক্তি-দ্বার,
মোর অস্থি মাঝেই মিল্‌বে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্জিকার !

৫৬

এই তো জানি বন্ধুগো মোর—সত্যজ্যোতির প্রকাশ টুক্
—রাগেই কিম্বা প্রেমেই ফুটে ভরায় যা' মোর আঁধার বুক—
নিমেষ তরে পাই যদি তার আভাসটা মোর পানশালায়,
আঁধার-ঘেরা মন্দিরেতে কেনই যাব—কোন্ জ্বালায় !

৫৭

তুমিই প্রভু পথটিতে মোর গর্ত্ত, বোঝাই রাখ্‌লে পাপ,
ক'র্‌লে সেটি সুরায় পিছল—তুমিই প্রভু ক'রবে মাপ ;
আপন হাতেই খুলবে না কোন্ ভাগ্য-সূতোর পাকটা ঘোর,
পতনটা সেই পাপের ফলে—ব'ল্‌বে কিগো দেবতা মোর ?

৫৮

মানব সৃজন ক'র্‌লে, দিয়ে মৃত্তিকাতে পাপের ছাপ,
মহান্ তোমার বিশ্ব-বাগে খেলাও পঞ্চ-রিপুর সাপ।
পাপের কালো মূর্ত্তি নিয়ে জীব জগতে ঘুর্‌ছে হায়—
মানুষ তোমায় ক'রছে ক্ষমা—তুমিও, হে দেব, ক্ষমিও তায় !

৫৯

শুন্‌ছ বঁধু—উপোস্ ভেঙে, রাত্রি যবে এক প্রহর,
রম্‌জানেরি পর্ব্বশেষে উঠ্‌নু গিয়ে কুমোর-ঘর,
চাঁদের দেখা নাই আকাশে, ঘরটিতে কেউ নাইকো আর—
শুধুই কেবল ভাঙ্গা-গড়া সুরাই যত মৃত্তিকার।

৬০

শুন্‌লে বঁধু অবাক্ হবে—সেই সাজানো মাটীর তাল—
তার মাঝে কেউ কথা শোনে, কেউবা বোনে কথার জাল।
ব'ল্‌লে কে এক হঠাৎ রোষে—ব্যস্তবাগীশ কণ্ঠ তার—
কেইবা এ সব কুম্ভ মোরা—কেইবা সেজন কুম্ভকার ?

৬১

ব'ল্‌লে সে এক কুম্ভ ধীরে—নয় বৃথা এ জীবন-শ্বাস,
করলে যে জন বুদ্ধি খরচ—সৃষ্টি আপন ক'র্‌বে নাশ ?
এ সব কি আর অম্‌নি যাবে—ফির্‌তে হবে পুনর্ব্বার,
সেই পুরাতন মাটীর ঘরে, সেই কবেকার জন্মাগার !

৬২

ব'ল্‌লে আর এক পেয়ালা তারে—তত্ত্ব এটা খুব গভীর,
বালক—সেও পানের পরে খোঁজটা রাখে পাত্রটির।
গ'ড়্‌লে যে জন আপন হাতে কতই স্নেহ-কল্পনায়—
আর কি পারে রাগের ভরে নষ্ট কভু ক'র্‌তে তায় !

৬৩

সেই কথাতেই শান্ত হ'ল উঠ্‌ছিল যে তর্কজাল ;
মৌন ভেঙে ব'ল্‌লে পরে বিশ্রী সে এক কাদার তাল—
বক্র ব'লে সই পরিহাস, চিন্তে না পাই দিখিদিক,
গড়ন-কালে কুম্ভকারের হস্তটা কি প'ড়্‌তো ঠিক ?—

৬৪

ব'ললে আর এক—কেউ বা তারে ব'ল্‌ছে পাজী যাচন্‌দার,
মুখখানা তার আঁক্‌ছে দিয়ে নরক-ধোঁয়ার অন্ধকার।
যাচাই মোদের ক'র্‌বে সে জন ?—কথার কথা ফক্কিকার—
লোকটা কিন্তু মন্দ সে নয়—মন্দ কি হয় তার বিচার !

৬৫

কোণটি হ'তে সুরাই সে এক বল্‌লে ফেলে নিশাস-ভার—
মাটীর দেহ শুকিয়ে গেছে—অনেক দিন তো নেই ব্যাভার ;
মোর পুরাতন দ্রাক্ষা-বঁধু—পাই যদি আজ স্বাদটি তার—
হচ্ছে মনে—জীর্ণ দেহে বলটা ফেরে পুনর্ব্বার।

৬৬

পাত্রগুলো কথার মাঝে আকাশ 'পরে দেখ্‌তে পায়
চন্দ্র নবীন—যার লাগিয়া সব আছিল প্রতীক্ষায় ;
কে কার ঘাড়ে পড়্‌ল তখন, ব'ল্‌লে দিয়ে টিপ্‌নি এক—
আজ খাদ্যেতে আর মদ্যে বোঝাই মুটিয়াগুলোর কাণ্ড ছাখ্‌ !

৬৭

চেতিয়ে তুলো মরণকালে দ্রাক্ষাসুধায় প্রাণটা মোর,
মদির-স্নানটা করিয়ে দিও, ঘুচ্‌বে যবে মায়ার ঘোর
পরিয়ে দিও যত্নে স্নেহে আঙুর-পাতার বহির্বাস,
আর গোর দিও এক বাগান-ধারে, সজীব যেথায় ফুলের চাষ।

৬৮

সৌরভেতে ক'র্‌বে আকুল, থাক্‌বে যা' মোর ভস্মসার—
জাল পেতে সে থাক্‌বে ব'সে, হাওয়ায় বুনে গন্ধ তার ;
ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল পড়্‌বে ধরা চ'লতে পথ,
মদিরগন্ধ পাগল হাওয়ায় উল্টো'বে তার বিধান-রথ।

৬৯

খেয়াল-পুজোয় পুতুল-খেলায় কাট্‌ল কতই দিন যে মোর,
লোকের চোখে দোষের ভাগী—র'ট্‌লো খারাপ নামটা ঘোর ;
মূর্ত্ত খেয়াল-দেব্‌তাগুলোই খাতির ডোবায় পেয়ালা মাঝ—
সুনামটা মোর সস্তা বিকোয় শুন্‌লে মিঠে সুরের ভাঁজ !

৭০

দিব্যি দিয়ে ত্যাগ করিনু—চক্ষুজলও প'ড়ল ঢের—
তবে শপথকালে হয়না মনে গিছ্‌লো কেটে নেশার জের !
তারপরে যেই ফাগুন এল, বাড়িয়ে গোলাপ-রঙীন হাত—
কোথায় গেল ক্ষীণ অনুতাপ, গন্ধ-আকুল মলয় সাথ !

৭১

খাতির খিলাৎ কাড়্‌লে সে মোর—খেয়ালমাফিক কার্য্য তার,
দ্রাক্ষাদেবীর নাই মহিমা—কাকের মতই সব ব্যাভার!
তবু প্রশ্ন ওঠে মনটাতে এই—দ্রাক্ষাফলের চাষটা যার—
কোন্ মহার্ঘ্য পণ্যলোভে বিকোয় এমন সুধার ভার!

৭২

হায়, গোলাপ সাথে প'ড়্‌বে খ'সে বসন্তেরি সব বাহার,
মিশ্‌বে কোথা যৌবনেরও পাগল-করা গন্ধভার!
পাতার মাঝে চ'ম্‌কে ওঠে আজ পাপিয়ার উচ্চতান—
কোন্ বিদেশের কণ্ঠটি ওই—কোথায় সে কাল গাইবে গান!

৭৩

নিয়ত্‌-দেবীর চর্‌কা-সূতোর ধর্‌তে পারি খেঁইটা আজ,
ভাগ্য সাথে ষড়্‌ ক'রে তার পাইগো খোলা দুয়ার-মাঝ;
নিঠুর পায়ে চূর্ণ করি বিশ্ব-সৃষ্টি কল্পনায়
নূতন সৃষ্টি গ'ড়তে প্রিয়া পারব নাকি দুই জনায়!

৭৪

দেখ্‌ছ প্রিয়া—পূব গগনের পূর্ণ-কিরণ চাঁদটি আজ
দিচ্ছে উঁকি পাতার ফাঁকে মোদের মিলন-কুঞ্জ মাঝ;—
তোমার কবি সেই যেদিনে ভুল্‌বে ধরার মিলন-সুখ,
কার খোঁজে ওর প'ড়্‌বে হেথায় অস্ত-মলিন দৃষ্টি-টুক!

৭৫

বিভোর প্রাণে আসবে যেদিন আমার মিলন-প্রতীক্ষায়,
তৃণাসনে অতিথ-সভা ছড়িয়ে যেথা তারার প্রায়।
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় করে' রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

দেশের কথা।

বাঙলার অনেক নেতার মুখে সেদিন শুনলুম যে, বম্বে ও মাদ্রাজের লোকেরা পলিটিকাল হিসেবে, আমাদের চাইতে ঢের বেড়ে গিয়েছে। এ সত্য তিনি দিল্লিতে আবিষ্কার করে, এসেছেন, অতএব বলা বাহুল্য যে, তিনি বামমার্গের একজন মহাজন।

একথা যদি সত্য হয়, তা'হলে আমরা লজ্জিত হ'তে বাধ্য কিন্তু এর জন্য আমাদের দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। ইংরাজের অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসেবে একদেশ হয়ে উঠেছে এবং ইংরাজি শিক্ষার গুণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশ মনে কিম্বা জীবনে এক ধাপ উঁচুতে চড়ে' যাবে, সে প্রদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে' তুলবে, এবং প্রতিবেশীর সাহায্যে আমরা বাঙালীরাও জাতি হিসেবে একটু উঁচুতে উঠে যাব! ইংরাজের আইন আমাদের জীবনকে এবং ইংরাজের ভাষা আমাদের মনকে একসূত্রে এমনি গেঁথেছে যে, একের টানে অপরে চলতে বাধ্য। সুতরাং বম্বে মাদ্রাজে যদি নবজীবনের আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি হয়েই থাকে—তাহ'লে সে জীবনী-শক্তি আমাদের মন প্রাণকেও ধাক্কা দেবে। এ ত সু-সংবাদ!

তবে কথাটা একেবারে সত্য বলে গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। প্রথমত, পলিটিকালি বেড়ে যাবার অর্থটা কি?—যদি কেউ বলেন যে, আমাদের তুলনায় অপর দেশের লোকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনটা বেশি মাত্রায় ও বেশি জোরে চালাচ্ছে, তাহ'লে তার উত্তর, সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনটাই যে জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষণ, তা অবশ্য নয়। বাঙলার বেশির ভাগ লোক আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নারাজ বলে' বাঙলার জাতীয় আত্মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে, এ রকম অনুমান একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই করতে পারেন—যাঁরা বাঙালীর মনের খবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে ও-রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, সে মনের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?—তার সহজ উত্তর, এক পলিটিক্স ছাড়া জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রেই। যে শিক্ষার ফলে, আমাদের নব মনোভাব জন্মেছে, সে শিক্ষা বাঙলা থেকে অন্তর্হিত হয় নি; বরং তার প্রসার ও প্রভাব বাঙলাদেশে দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলেছে। সুতরাং বাঙালীর চৈতন্য ইতিমধ্যে জড়ীভূত হয়ে যাবার কোনও কারণ ঘটে নি। তারপর সে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ যিনি খুসি তিনি ইচ্ছা করলেই সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখতে পাবেন। অবশ্য রাজনীতির কর্ত্তা-ব্যক্তিরা এ সব জিনিষের বড় বেশী খোঁজ রাখেন না, তাঁদের ধারণা যে, রাজনীতিই হচ্ছে জাতীয় জীবন গড়ে' তোলবার একমাত্র উপাদান ও উপায়। লোকের সামাজিক জীবন দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের কতটা অধীন, আর দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র লোকের সামাজিক জীবনের কতটা অধীন, এবং এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণের কি সম্বন্ধ আছে, সে সব তর্ক এক্ষেত্রে

তোলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা দেশের কথা বলতে আজকাল অনেকে রাজনীতির কথাই বোঝেন, সে কথার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য করে নিয়েই আমি এ বিষয়ে দু'টি চারটি কথা বলতে উদ্যত হয়েছি।

আজকালকার দিনে মানুষের পক্ষে তার রাজনৈতিক অবস্থা যে উপেক্ষা করা চলে না—একথা বলাই বাহুল্য। তারপর রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন যে, একটি প্রকৃষ্ট অন্তত প্রচলিত উপায়, সে-কথাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। তবে যে বাঙালী জাতি এ বিষয়ে কতকটা ঔদাসিন্য প্রকাশ করছে তার কারণ, একমাত্র বক্তৃতার উপর বাঙালীর আস্থা কমে এসেছে। কেন কমে এসেছে তার কারণ কি আর খুলে বলা দরকার? কে না জানে যে, ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর মন পলিটিকালি কিঞ্চিৎ পোড় খেয়েছে—সুতরাং সে মন সহজে আর কারও কথায় ভেজে না। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, বহুলোকের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলবার সমস্যাটা এতই জটিল ও গুরুতর যে-কোন সহজ উপায়ে তার সমাধান করা যেতে পারে না।

আর এক কথা, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপর আমরা অনেকে একান্ত নির্ভর করতে পারিনে। তার একটি কারণ, তাঁদের সকল কথা, সকল ব্যবহার আমাদের সকলের কাছে সমান সু-বোধ নয়। এই ধরুণ না, বাঙলার রাজনৈতিক দলে কেন যে একটা দলাদলীর সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ আমরা সকলে খুঁজে পাইনে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, রিফর্ম নিয়ে সকলের একমত হওয়ার কোনই বাধা ছিল না। বাঙলার নেতারা আজ দেড় বৎসর ধরে পরস্পরের সঙ্গে যে রকম জ্ঞাতি-শত্রুতা সুরু করেছেন,

তার থেকে তাঁরা নিজেদের মন নিজেরা জানেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ হয়। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁরা এমন এক একটা ব্যবহার করে বসেন যে, আমাদের মনে সে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য একমাত্র কথার সাহায্যেই করতে হয়, এবং কথারও যে একটা শক্তি আছে, সে সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বাক্‌যুদ্ধও ত একটা যুদ্ধ বটে এবং এ যুদ্ধে কথাই হচ্ছে মানুষের অস্ত্র-শস্ত্র, এমন কি স্থল বিশেষে তা poisonous gas-ও হতে পারে! তবে কথার কোনই শক্তি থাকে না, যদি না তার কোনও অর্থ থাকে। রাজনীতিতে আমরা বিলেতি কথা নিয়ে কারবার করি, সম্ভবত সেই কারণে আমাদের দেশী নেতাদের মুখে সে সব কথা অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে। এবং এই কারণেই তাদের কথার প্রতি আমাদের আস্থা দিন দিন কমে আসছে। যদি liberty এবং equality শব্দের পূরো অর্থ আমাদের নেতা মহাশয়দের সর্ব্বদা স্মরণ থাকত তাহ'লে, তাঁরা বম্বে কংগ্রেসে, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নকল করে "Rights of man" declare করে', তার দু'দিন পরেই সিমলার লাট দরবারে উপস্থিত হয়ে প্যাটেল বিল সম্বন্ধে, না-হুঁ, না-হুঁ করতেন না। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে যাঁদের বুক ফুলে' ওঠে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে' তাঁদের যে মুখ শুকিয়ে যায়, এই স্পষ্ট প্রমাণ যে, liberty প্রভৃতি শব্দ তাঁদের কথা মাত্র, ভাষায় যাকে বলে 'বুলি'।

আমাদের নেতাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে কথা দ্বারবঙ্গ, গিধড় প্রভৃতি রাজা-মহারাজাদের মুখে শোভা পায়, সে কথা তাঁদের মুখে শোভা পায় না, কেননা আমরা আশা করি যে, কি বিদ্যায় কি বুদ্ধিতে,

কি জ্ঞানে, কি চরিত্রে তাঁরা উক্ত রাজা-মহারাজাদের দলভুক্ত নন। বঙ্গে মাদ্রাজের তুলনায় আমাদের আত্মা যতই ঘুমিয়ে থাক্ না, একথা বোধ হয় জোর করে বলা যায় যে, বেহারী জমিদারদের চাইতে আমাদের পলিটিকাল আত্মা কিঞ্চিৎ বেশি প্রবুদ্ধ। কিন্তু যখন দেখি যে, দ্বারবঙ্গের মহারাজা ধুয়ো ধরলে আমাদের কোন কোন নেতা অমনি দোহার দিতে সুরু করেন, তখন তাঁদের রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

রাজনীতির নেতাদের যে রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয় নি এমন কথা আমরা বল্‌তে চাই নে। তাঁরা যে উল্টো উল্টো কথা বলেন, এবং উল্টো উল্টো ব্যবহার করেন, সে হয়ত চাল হিসেবে। কিন্তু আমরা যেহেতু নেতাদের চালের গূঢ় অর্থ বুঝি নে, সে কারণ আমরা তাঁদের কথার সাদা অর্থ বুঝতে চাই, এবং যতক্ষণ তা না বুঝতে পারি, ততদিন তাঁদের কথায় নেচে উঠতে পারি নে, যদি কিছু পারি ত হেসে উঠতে। যাঁরা প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের এ যুগের রাজনীতির কোন কথা মুখে আনবার পর্য্যন্ত যে অধিকার নেই, এই সহজ কথাটা যতদূর সম্ভব সহজ কথায় বোঝাতে চেষ্টা করব। কথাটা সহজ এই কারণে যে, বর্ত্তমান রাজনীতির মূল কথাগুলির জন্ম যদিচ ইউরোপে হয়েছে; কিন্তু তা সকল দেশের সকল মানবের প্রাণের কথা, কেননা যেখানেই মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে—সেখানেই স্বাধীনতা ও সাম্যের ধর্ম্ম মানুষের মনকে অধিকার করে বসবে।

(২)

আজকাল আমাদের রাজনীতির রাজ্যে দু'টি কথা নিত্যই শোনা যায় এবং তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সে দু'টি হচ্ছে self-determination এবং democracy. আমাদের হাল পলিটিক্সের সকল বলা-কওয়া, সকল আশা-ভরসা ঐ দু'টি শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের নেতারা ঐ দু'টি শব্দের মন্ত্র-শক্তিতে এতদূর আস্থাবান যে, এবারকার কংগ্রেস Peace Conference-এর জন্য delegate নির্ব্বাচন করেছেন! কংগ্রেস যদি self-determination শব্দের মোহিনী-শক্তিতে মোহপ্রাপ্ত না হ'তেন,—তাহ'লে কি এমন বাহ্যজ্ঞান শূন্যতার পরিচয় দিতেন? সে যাই হোক, আমাদের পলিটিকাল বল-বুদ্ধি-ভরসা সকলই যখন ঐ দু'টি শব্দের উপর নির্ভর করছে, তখন কথা দু'টির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ভুলে' গেলে চলবে না যে, কথা দু'টি শুধু বিলেতি নয়, তার অর্থও বিলেতি।

প্রথমত ডিমোক্রাসি বলতে কি বোঝায়, তার সন্ধান ডিমোক্রাসির স্রষ্টা এবং দ্রষ্টাদের কাছে নেওয়া যাক, কেননা self-determination মতটা ঐ ডিমোক্রাসি হতেই উদ্ভূত। এই ডিমোক্রাসি শব্দের তিনটি সংজ্ঞা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

1. "Everybody is to count for one and nobody for more than one"—*Bentham.*

2. "Democracy is the government of the whole people by the whole people"—*Mill.*

3. The progress of all through all"—*Mazzini.*

মধ্যপথ অবলম্বন করা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই নিরাপদ ; সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মিলের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য করা যাক। ম্যাটসিনির সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা দর্শনের কোঠায় পড়ে এবং আর বেন্থামের সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা পাটীগণিতের কোঠায় পড়ে। সংক্ষেপে ম্যাটসিনির সংজ্ঞাকে অনেকটা সঙ্কুচিত এবং বেন্থামের সংজ্ঞাকে অনেকটা প্রসারিত না করলে তা রাজনীতির সূত্র হয়ে দাঁড়ায় না। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক যে, সকলের দ্বারা সকলের শাসন-পদ্ধতির নামই ডিমোক্রাসি।

কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। সকলের দ্বারা সকলের শাসনের কি কোনও অর্থ আছে, রাজা প্রজার কি অধিকার ভেদ নেই, রাজ্য-শাসন বিষয়ে সকলেই কি সমান অধিকারী ? আর যদিই বা তা হয়, তাহ'লে সকলের দ্বারা সকলের শাসন যে সু-শাসন হবে তারই বা মানে কি ?

ডিমোক্রাসির প্রতিবাদীরা এ প্রশ্ন ইউরোপে একবার নয়, হাজার বার তুলেছেন এবং ডিমোক্রাসির বিরুদ্ধে এই তর্ক তুলে এক আধখানা নয়, হাজার হাজার বই লিখেছেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে ডিমোক্রাসির স্বপক্ষের যে কি বক্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান যুগের একটি বড় ঐতিহাসিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"One theory regards the definite purpose of the government to be the assurance of liberty to the individual. * * * Such is the theory of the Liberal Radicals"—*Seignobos.*

অর্থাৎ ডিমোক্রাসি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রতন্ত্র, কেননা এই তন্ত্রের প্রসাদে প্রতি ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য যে, ডিমোক্রাসির ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে,—

Individuals should be allowed to develop without restraint. They will be happier and more active, they will be able to make more progress, society will regulate itself better than under established rules"—*Seignobos.*

অতএব দাঁড়াল এই যে, যিনি individual liberty অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করেন, ডিমোক্রাসির নাম উচ্চারণ করবার তাঁর অধিকার নেই। এখানে আর একটি কথা বলে রাখি, ডিমো-ক্রাসি এ যুগে ইউরোপে একটি দার্শনিক মত মাত্র নয়, এখন তা সমাজের ধর্ম্ম। ডিমোক্রাসি সে দেশে এখন শুধু বইয়ের ভিতর নেই,—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি একটি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে Seignobos-এর ইতিহাস থেকে ইউরোপের বর্ত্তমান সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করে দিই, এখানে তা পুনরুদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোনও অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।"

অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই

হচ্ছে ডিমোক্রাসির গোড়ার কথা, আর শেষ কথা এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির ভিত্তি ও চূড়া।

স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসির মূলমন্ত্র; কিন্তু এই স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? ফ্রান্সের যে declaration-এর নকলে আমাদের নেতারা বম্বেতে নিজেরা এক declaration করেছেন, সেই দলিলেই liberty শব্দের অর্থ পাওয়া যাবে। সে declaration of Rights-এর চতুর্থ দফাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"Liberty consits in the power to do anything that does not injure others; thus, the exercise of the natural rights of every man has only such limits as to assure to other members of society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law."

এ সংজ্ঞার অনেক খুঁত ধরা যায়, কিন্তু liberty-র এ ব্যাখ্যা মোটামুটি সত্য এবং এই সত্যের উপরেই ডিমোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁরা রাষ্ট্রতন্ত্রে ডিমোক্রাসি চান, তাঁদের পক্ষে প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধাচরণ করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে বিবাহ করবার অধিকার হচ্ছে মানুষের একটি স্বাভাবিক অধিকার, এবং এ অধিকার যত দিন আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সে অধিকারে প্রতিলোক বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতি এবং সমাজের দোহাই দেওয়াটা ডিমোক্রাসি-বিদ্বেষীদের চিরকেলে স্বভাব। ইউরোপের লোকেরা যখন খৃষ্টীয় শাসন-তন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে

বিবাহ করবার অধিকার দাবী করে, তখনও সে দেশের absolutist-রা বরাবর ঐ ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ রক্ষার দোহাই দিয়ে এসেছে। জর্ম্মানীর উদাহরণ নেওয়া যাক। জর্ম্মানীর লিবারলরা চিরকালই বিবাহ সম্বন্ধে এই স্বাধীনতার দাবী করত, কিন্তু সে দেশের ধর্ম্মযাচকেরা এবং রাজপুরুষেরা চিরদিনই তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মান-সম্রাট দেশের লোককে এ অধিকার দিতে বাধ্য হন। সে সময় কন্সারভেটিভের দল গভর্ণমেণ্টকে এই বলে' আক্রমণ করেন যে, গভর্ণমেণ্ট "প্রুসিয়াকে ইউরোপ করে তুলছে এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম এবং সমাজের মূলচ্ছেদ করছে"। প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এই যে, তার ফলে হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় সমাজ হয়ে দাঁড়াবে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। একথা যাঁরা বলেন তাঁদের মুখে ডিমোক্রাসির নাম, জীববিশেষের মুখে রাম নামের মতই শোনায়।

শেষে self-determination অর্থ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা democracy-র মূলমন্ত্র, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই হচ্ছে self-determination-এর গোড়ার কথা। যে স্বাধীনতা পূর্ব্বে সভ্য-সমাজের কাছে ব্যক্তিগত হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা এখন জাতিগত হিসেবে গ্রাহ্য হচ্ছে। এক একটি জাতিকে এক একটি ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে', সে জাতির যে নিজের ইচ্ছা রুচি ও চরিত্র অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার আছে, এই মতটারই বিলেতি নাম হচ্ছে self-determination. বেন্থামের কথায় বলতে গেলে এ মতে প্রতি জাতিই is to count for one এবং কোন জাতিই is not to count for more than one এবং declaration of

rights-এর ভাষায় বলতে গেলে, প্রতি জাতিরই স্বাধীনতা আছে—to do anything which do not injure others, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কথা সকলকে স্মরণ রাখতে বলি যে, একটি জাতির কোনও self নেই—ব্যক্তির ধর্ম্ম জাতিতে আরোপ করে' আমরা জাতিকে ব্যক্তি বলি। Self-determination ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত জাতির পক্ষে আরোপিত মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিগত self-determination-য়ে যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মুখে national self-determination-এর কথা কাকাতুয়ার বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। ডিমোক্রাসি, লিবারালিজম প্রভৃতি শব্দ যাঁদের পক্ষে মুখের কথা নয় কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের সামিল তাঁদের কাছে ও সকল শব্দের অর্থ যে কি, একটি উঁচুদরের ইংরাজ লেখকের কথায় তার পরিচয় দিচ্ছি:—

"Liberalism is the belief that society can safely be founded on this self-directing power of personality, that it is only on this foundation that a true community can be built, and that so established its foundations are so deep and so wide that there is no limit that we can place to the extent of the building. *Liberty then becomes not so much a right of the individual as a necessity of society*" :—L. T. Hobhouse.

যাঁরা সমাজ হিতের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পঙ্গু করতে চান,—তাঁদের উপরোক্ত কথা ক'টি একটু মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।